KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. KLMLGK 2007	Place of Publication ২৫/২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
Collection KLMLGK	Publisher সৌরীন্দ্রনাথ দাস
Title শনিবারের চিঠি	Size 4.5" x 6.75" 11.43 x 17.14 c.m.
Vol. & Number ১৩/৮ ১৩/১০ ১৪/১-৬	Year of Publication জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ শ্রাবণ, ১৩৪৮ কার্তিক, ১৩৪৮ – চৈত্র, ১৩৪৮
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor সজনীকান্ত দাস, অমলকুমার দাশগুপ্ত	Remarks : No. of Pages missing.

CD Roll No. KLMLGK

শনিবারের চিঠি

১৩৪৮

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ষাণ্মাষিক সূচী

কার্ত্তিক—চৈত্র ১৩৪৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
অদৃষ্ট ...	৪৯৬
অমীমাংসিত—সৈয়দ অলিউল্লাহ	৭২৬
আমরা ...	৫৮৯
আলোচনা ...	৪০৯
ইতিহাস—শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু ...	৪৮৬
ইভ্যাকুয়েশন ...	৪৭২
উপমা ...	৫২৪
এ. আর. কি. ...	৪৮৫
এরা আর ওরা ...	৩১২
ওরা এবং আমরা —শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৪৭৩
ওস্তাদের মার—"সম্বুদ্ধ" ...	৩৭৭
কালীপূজা ...	১০৩
ক্ষণ-শাশ্বতী ...	৭০৪
'ক্ষণিকা' ...	৬০৭
গুরু-বন্দনা ...	৫২৩
চক্রবৎ— ...	৫৩৩
চণ্ডীদাসের ভাষা —শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ	৮১
চণ্ডীদাসের ভাষার আরও কয়েকটি বিশিষ্ট শব্দ ও বাগ্বিধি —শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ	৩০৯
চলচ্চিত্র—শার্দ্দূল ...	২৬২
ছায়া-ছবি—শ্রীউমা দেবী ...	৫০৬
ছোটগল্প—"বনফুল" ...	৫৩৯
জন্মদিনে —শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৪৭
জমিদারির অপমৃত্যু —শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগুপ্ত	৬৫১

বিষয় ...	পৃ
ডুবিল অরুণ রবি —শ্রীপুষ্পরঞ্জন মজুমদার	১১
ডেস্ক-ক্যালেণ্ডারের প্রতি ...	৪৫
তীর্থপথে ...	৩৯
তুক ...	৫৫
দর্শন ...	১৮
দুর্ঘটনা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষাল	২৫
নরায়ণ ...	২
নিবেদন —শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬
নিশিপালন ...	৫
পঞ্চম পক্ষ—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী	৩
পদাঘাত—শ্রীগণেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৬০৯, ৬
পাথরের বাসন—শ্রীবাণী রায়	১
পাদুকা—গোলাম কুদ্দুস ...	২
পিতা-পুত্র—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৪৪৪, ৫৭৩, ৭
পুনর্বসন্ত ...	৬
পুরোহিত—শ্রীউমা দেবী ...	১
পূর্ণচ্ছেদ—বারায়ণী ...	৫
প্রণাম—"বনফুল" ...	৭
প্রতিভার যুগ-সূর্য্য অস্ত গেল —শ্রীসুখরঞ্জন রায় ...	১
প্রথম দর্শন —শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	
প্রশ্ন ...	৫
প্রশ্ন—শ্রীশান্তি পাল ...	১
প্রশ্নোত্তর—শ্রীগণেশ ...	

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রসঙ্গ কথা ...	১২৯
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা —বঙ্কিমচন্দ্র	২৮০
"বশীকরণ" ও 'ফাল্গুনী' ...	৪১৭
বহ্নিশিখা—শ্রীনমিতা মজুমদার	২২৯
বাংলা গদ্যের আদর্শ ...	৫২৫
বাংলা বুলি ...	১৪৮
বাড়ি ভাড়া—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	৭২৪
বিজয়া ...	৬৪
বিদ্যাসাগর—"বনফুল"	৬৫, ২১৩, ৩৬৩
বিয়োগ-ব্যথা—শ্রীপ্রীতিময়ী কর	১১৫
বিলম্বিনী ...	৬৮৩
বীরবলের আত্ম-পরিচয় —শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ...	১৭৭
বৈরাগ্য—শ্রীপুষ্পরঞ্জন মজুমদার	৪৯৭
বোলপুর ...	৫৩৪
বৌ-পালানো যুদ্ধ —শ্রীসুলতা সেনগুপ্তা ...	৪২৬
ব্যাধি ও প্রতিকার ...	২৮১
ব্যোম	৫৩৭
মনঃসমীক্ষণ—শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র	৪৩
মাঘী-পূর্ণিমা ...	৫৯০
মানস-বাদল—শ্রীউমা দেবী ...	৭৩১
মানস-সরোবর ...	১৪৫
মৃত্যুপথিক রবীন্দ্রনাথের শ্রীচরণে —শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ	১০৯
মৃত্যুহীন রবীন্দ্রনাথ —শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ	১১৪
রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী ...	১৩৬
রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ	৫, ১৬১
রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু—শ্রীউমা দেবী	১০৫
রবীন্দ্রপরিবেশ—শ্রীরাজশেখর বসু	১
রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী	১৩, ২৯২
রাতের বাজার —শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী	৫৯৬
রূপান্তরিতা—শ্রীজগদীশ গুপ্ত	৪২
লহ অর্ঘ্য গুরুদেব —শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	১০৪
লেখন—রবীন্দ্রনাথ ...	৬৩৫
শব-সম্ভাষ—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	২৯৬
শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ —শ্রীসত্যব্রত মজুমদার	১১৭
শিলাইদহের রবীন্দ্রনাথ —শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস	১১৩
'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' ও চণ্ডীদাস-পদাবলী —শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ	৫৪৬
সংবাদ-সাহিত্য	১৩৮, ২৬৫, ৩৯৯, ৫০৮, ৬২১, ৭৩৪
"সংশ্রয়দ্রুমে গজভগ্নে"— —শ্রীসুশীলকুমার মজুমদার	২৫৯
সংস্কৃত-সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ —শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ সোম	৮৯
সনাতন—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭
সমালোচকের প্রতি—শ্রীমালবিকা রায়	৫২২
সরোজিনী—শ্রীঅমলা দেবী	১৯৩, ৩৪২, ৪৩৫, ৫৫৫, ৬৮৬
সান্ত্বনা ...	২২৮
স্ত্রী—শ্রীযামিনী কর ...	২৪৬
স্বভাব-ধর্ম্ম—"সব্যসাচী" ...	৬০
হেঁয়ালি ...	৫৭২
হোলি—শ্রীসত্যনারায়ণ ...	৫৯১
১৩ই শ্রাবণ ১৩৪৮—"বনফুল"	৪২৭
১৯৪২ ...	৪১১
Stop Press ...	২৯৫

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও

১৩শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ [৮ম সংখ্যা

রবীন্দ্র-জন্মদিন

রবীন্দ্রনাথের একাশীতিতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আপনাদের এই উৎসব-সভায় আহ্বান করিয়া আপনারা সত্যই আমাকে একরূপ ঋণপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন—আপনাদের সহিত একত্রে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবন কামনা করিবার এই সুযোগ আমি অপ্রত্যাশিতরূপে লাভ করিলাম। কবি এখনও বাঁচিয়া আছেন ইহা যে আমাদের কত বড় সৌভাগ্য, তাহা অন্য সময়ে ভাবিবার অবকাশ আমাদের নানাচিন্তাগ্রস্ত দুঃস্থ জীবনে প্রায় ঘটে না; বৎসরের মধ্যে একবার তাহাই স্মরণ করিয়া, দুর্ভাগ্যের অতল তলে ডুবিয়াও সেই সৌভাগ্যের আশ্বাসে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হই—এ জাতির ভগ্নপ্রায় জীর্ণ প্রাসাদের সেই একটি মাত্র অবশিষ্ট স্বর্ণচূড়ার পানে চাহিয়া মনে হয়, আমরা সত্যই এত হীন এত দীন নই; যে জাতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভার উদয় সম্ভব হইয়াছিল, সে জাতি হয়তো একেবারে বিনষ্ট হইবে না। তাই আজিকার এই দিনটিকে আমরা

একটি বড় উৎসব-দিবস বলিয়া মনে করি। এই দিন আমরা নিরাশার অন্ধকারে একটু আশার আলো জ্বালি, বর্ত্তমানের পরাভব-লাঞ্ছনার মধ্যে, অতীতের ওই এখনও-দৃশ্যমান গৌরবগিরিকে উৎফুল্ল চিত্তে প্রদক্ষিণ করি।

আজ রবীন্দ্রনাথের বয়স অশীতি বৎসর পূর্ণ হইল্ ইহা ভাবিলে আনন্দ হইবারই কথা; কিন্তু আধুনিক বাঙালীর সাধারণ আয়ুষ্কাল যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে হয়তো সেই আনন্দের সঙ্গে একটু বিস্ময়ের ভাবও আছে—ইহা সত্য হইলে, এ জাতির জন্য চিন্তিত হইতে হয়। একালে আমাদের সমাজে দীর্ঘজীবী পুরুষ এমনই বিরল হইয়াছে—যে, সত্তর পার হইলেই—এমন কি, ষাটের উর্দ্ধে পৌঁছিতে পারিলেই, মনে হয়, সে ব্যক্তি যথেষ্ট বাঁচিয়াছে; তখন তাহার মৃত্যু হইলে, দুঃখ করা দূরে থাক, তাহাকে অসাধারণ সৌভাগ্যবান মনে করিয়া আমরা হয়তো কিঞ্চিৎ ঈর্ষাই অনুভব করি। এবারে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন, এত দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকা একপ্রকার ধৃষ্টতা—তেমন ব্যক্তি সমাজের নিকটে যেন অপরাধী হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের মত পুরুষকেও এমন কথা বলিতে হয়, ইহা ভাবিয়া আমি—সেই সমাজের একজন—অতিশয় সন্তপ্ত বোধ করিতেছি। একালের এই সমাজে, জাতির চূড়ান্ত অধঃপতন ও চরম দুর্গতির দিনে, রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তির বাঁচিয়া থাকা—আমাদের ভাগ্যবিধাতার পরিহাস বলিয়া মনে হইতে পারে, কবি নিজেও তাই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছেন; কিন্তু ইহাতে কোন্ চিন্তাশীল সহৃদয় বাঙালী সন্তপ্ত না হইয়া পারে? তাই আজিকার এই আনন্দ-উৎসবে যোগদান করিয়াও আমি আমার মন হইতে একটি গভীর বিষাদের বেদনা দূর করিতে পারিতেছি না। এক দিকে রবীন্দ্রনাথের গুরুতর স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য যেমন ভয় হইতেছে—এই উৎসব-দিন হয়তো আর ফিরিয়া পাইব না,

তেমনই, অপর দিকে রবীন্দ্রনাথের ওই উক্তি আমাদের বর্ত্তমান জীবনের নানা গ্লানি ও তজ্জন্য যে কঠোর শাস্তি বা প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন স্মরণ করাইয়া দিতেছে, তাহাতেও প্রাণে শান্তি পাইতেছি না। তথাপি এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিবার যে সুযোগ আপনারা আমাকে দিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা হৃদয়ভার লাঘব করিয়া যেটুকু সুস্থ হইতে পারিব বলিয়া মনে হইতেছে, তজ্জন্য আমি পুনরায় আপনাদিগকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আজিকার যাঁহারা তরুণ সম্প্রদায় তাঁহাদের মনোভাব আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই, তার কারণ—আমার শিক্ষা ও সংস্কার, আমার মানস-আদর্শ ও জীবন-দর্শন এতই ভিন্নমুখী যে, কোনখানে কোন দিক দিয়া তাঁহাদের সহিত পরিচয় অসম্ভব। তথাপি গত ১৫।২০ বৎসর যাবৎ, নানা বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ দুর্য্যোগে, আমাদের মনোজীবনে একটা প্রবল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিতেছি। কিন্তু সহসা জাতির অতীতের সঙ্গে এমন একটা বিচ্ছেদ ও বিরোধের কারণ কি তাহা আমি এখনও স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই। অতীতের কতকগুলি বদ্ধ সংস্কার উনবিংশ শতাব্দীতেই ভাঙিতে আরম্ভ হইয়াছিল—বাঙালীর শক্তি ও স্বাস্থ্য, প্রতিভা ও পৌরুষ সেদিনও সম্পূর্ণ অটুট ছিল বলিয়া, আমরা যুগ-দেবতার আহ্বানে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিয়াছিলাম। ইহারও পূর্ব্বে আমাদের ইতিহাসে যে আর একটা যুগ-সঙ্কট আসিয়াছিল, তাহার আঘাতেও সেবার আমরা যেমন উজ্জীবিত হইয়াছিলাম—ষোড়শ শতাব্দীর সেই আর এক দুর্য্যোগকে আমরা যে ভাবুকতা, মনীষা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার বলে, নবধর্ম্ম ও নবসংহিতা, নূতন গীতি ও নূতন মন্ত্রের সাহায্যে জয় করিতে পারিয়াছিলাম—এবারেও ঠিক তেমনই আমাদের জড়তাগ্রস্ত জীবন ভেদ করিয়া আবার সেই

শক্তি ও সেই প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছিল, অর্থাৎ জাতির জীবনীশক্তি তখনও অটুট ছিল। রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর সেই নূতন অগ্নি-হোত্রের সর্ব্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ হোতারূপে—বঙ্কিম-বিবেকানন্দের যুগকেও অতিক্রম করিয়া—আমাদের কালে বিদ্যমান রহিয়াছেন; তিনিই বাঙালীর সেই নব-উত্থিত মনোভূমির নূতন পলিমৃত্তিকা নিরন্তর কর্ষণ করিয়া প্রায় শতাব্দীকালের সাধনা অব্যাহত রাখিয়াছেন। আধুনিক যুগের যে ভাব ও চিন্তারাজি সর্ব্বমানবীয় সাধনার অঙ্গীভূত না হইয়া পারে না, তাহার সেই গভীরসঞ্চারী স্রোতোধারাকে তিনি আমাদের প্রাণমনের অনুরূপ তরঙ্গে তরঙ্গায়িত করিয়া যে ভাষা ও সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ভাব-চিন্তার অভিনবতা ও সূক্ষ্মতাকে ব্যক্ত করিবার জন্য বাংলা বাক্-ভঙ্গিকে যে ভাবে নিয়ত নূতন সামর্থ্যে মণ্ডিত করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা জীবন্ত ও যুগযোগ্য আর কি হইতে পারে? রবীন্দ্র-সাহিত্যের আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে, এ সাহিত্য অতিশয় গতিশীল—ইহা একটি বৃহৎ জলাশয়ের আকারে, শেষ বিস্তৃতি বা গভীরতা লাভ করিয়াই স্থির হইয়া যায় নাই। এ সাহিত্য নদীর আকারে বহিয়া চলিয়াছে, এবং পথের প্রকৃতি অনুসারে দিকে দিকে প্রবর্ত্তিত ও নানা ছন্দের হিল্লোল-কল্লোলে মুখরিত হইয়াছে। এই সাহিত্যেই বাঙালীর অভিনবতম চিত্তপ্রকর্ষের আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে—এই এক কবি-মনীষীর দ্বারা আমাদের সাধনায়, জগৎ ও নিজ সমাজ, অতীত ও বর্ত্তমান, যুগ ও সনাতনের যোগ রক্ষিত হইয়াছে; এবং গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া এই অক্লান্ত ও সদাজাগ্রত পুরুষ, বহু ঘূর্ণাবর্ত্ত ও একাধিক ঝড়ঝঞ্ঝার আক্রমণ সত্ত্বেও, দৃঢ় হস্তে হাল ধরিয়া আমাদের জাতিধর্ম্ম ও সত্যধর্ম্মকে ভরা-ডুবি হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। অতএব, অতি-আধুনিক

তরুণ-সম্প্রদায়ের মন সাহিত্যে এমন কি নবত্বের কামনা করে, রবীন্দ্র-সাহিত্য যাহার পরিপন্থী? বাঙালী যাহারা তাহারা এমন কি ভাব এমন কি চিন্তার অধিকারী হইয়াছে, যাহার ধারা এই ধারার সম্পূর্ণ বিপরীত? যদি তাহা এতই বিরোধী হয়, তবে বুঝিতে হইবে, জাতির জীবন-ধারায় ছেদ পড়িয়াছে; আজিকার এই নব্য সাহিত্যে যে শ্বাস বহিতেছে তাহার ধ্বনি যে এমন বিচিত্র, তার কারণ, সে শ্বাস সুস্থ বা স্বাভাবিক নয়—তাহা বক্ষ-শ্বাস নয়, নাভি-শ্বাস।

রবীন্দ্রনাথের পরে আমাদের সাহিত্যে এপর্য্যন্ত ছোট বড় মাঝারি যে সকল লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের কেহই—বঙ্কিমচন্দ্রের পরে যেমন রবীন্দ্রনাথ, তেমনই—রবীন্দ্রনাথের পরে তাঁহার আসনে বসিবার মত প্রতিভার পরিচয় দেন নাই। গল্প, নাটক কবিতা বা উপন্যাস রচনায় অল্পাধিক কৃতিত্বের কথা বলিতেছি না; জাতির চৈতন্যমূলে দীপ্তি-সঞ্চার—এক সর্ব্বাশ্রয়ী ভাব-দৃষ্টির সাহায্যে, সর্ব্বকাল ও সর্ব্বজাতির মধ্যে নিজ জাতিকে স্থাপন করিয়া তাহার শক্তি ও অশক্তি, তাহার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য গণনা; এবং তাহা হইতেই তাহার মুক্তিপথ নির্দ্দেশ; এবং সর্ব্বশেষে, যে-ভাষা জাতির আত্মপরিচয় ও আত্মরক্ষা, আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশের একমাত্র সাধন, সেই ভাষার অক্ষর-গুলিতেই যেন মন্ত্রশক্তির সঞ্চার—এ সকল কার্য্য গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে আর কোন সাহিত্যিকের দ্বারা এমন ভাবে সাধিত হয় নাই। আজিও এই বৃদ্ধ জরাজীর্ণ পুরুষই বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে একমাত্র দ্রষ্টা ও স্রষ্টা কবিরূপে বিরাজ করিতেছেন।

আমি জানি, আমার এসকল কথায় আজিকার নব্য সম্প্রদায় যুগপৎ অধর এবং ভ্রূ কুঞ্চিত করিবেন; তাঁহারা ইতিমধ্যেই এই মর্ম্মে ফতোয়া জারি করিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের বাণী এবং তাঁহার মন্ত্র দুই-ই কালের

জঠরে জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে; রবীন্দ্রনাথ যে ঋতুর ফুল সে ঋতু আর পৃথিবীতে নাই—সে ফুল শরতের শতদল হইলেও, আজিকার এই শীত-সন্ধ্যায় তাহা ম্লান বিশীর্ণ ও কুৎসিত হইয়া গিয়াছে। আবার কাহারও মতে, পৃথিবীর ইতিহাসে এ যাবৎ কোন শরৎ বা বসন্ত ঋতুরই আবির্ভাব হয় নাই; আমরা যাহাকে কুসুমাকর বলিয়া থাকি তাহা আসলে মানুষের শোণিত-শোষক অতি দীর্ঘ ও দুঃসহ নিদাঘ; তাহাতে যাহারা মধুমাস যাপন করিয়াছে এবং এখনও করিতে চায়, তাহাদের মত মহা পাপিষ্ঠ আর নাই—তাহারাই মনুষ্যসমাজের চিরশত্রু। এ কথার জবাব দিবার প্রয়োজন আপাতত নাই; যে নূতন সমাজ, নূতন রাষ্ট্র ও নূতন ধর্মের কল্পনা আধুনিক দুর্গত মানুষকে অতিমাত্রায় প্রলুব্ধ করিতেছে—তাহার তথ্যগত বা তত্ত্বগত সত্য প্রমাণ করিতে না পারিলে, সাহিত্যকে এক আদর্শ হইতে আর এক আদর্শে ভাবান্তরিত করিতে না পারিলে, এমন কি, মানুষের প্রকৃতিকে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে ধারণা করিতে না পারিলে—রবীন্দ্রনাথ, তথা সকল অতীত কবি-মনীষীর বাণী মূল্যহীন হইবে না। এই যে মত-বিরোধ, আজ পৃথিবীব্যাপী সমরাঙ্গনে তাহার মীমাংসা হইতে চলিয়াছে—সমগ্র মানবমণ্ডলী দুই বিরোধী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া ইহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে উদ্যত হইয়াছে। অতএব এ সম্বন্ধে ঠিক এইক্ষণে তর্ক-বিতর্ক করিয়া লাভ নাই। আমি কেবল জোর করিয়া ইহাই বলিতে পারি যে, আমাদের সমাজে যাহারা এই ধর্মের ধ্বজা তুলিয়া কোলাহল করিতেছে, তাহারা যে সত্যই কোন ধর্মের ধার্মিক—এমন প্রমাণ আমরা এ পর্য্যন্ত পাই নাই। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাহারা এই নবধর্মের দোহাই দিতেছে তাহাদের প্রায় সকলেই দুর্ব্বল, অসুস্থ, আত্মভ্রষ্ট; অধিকাংশই ঘোরতর অশিক্ষিত, অথবা বিদ্যার এক একটি গ্রামোফোন-যন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আত্মভ্রষ্ট বলিয়া তাহারা কিছুই আত্মসাৎ করিতে পারে না, তাই বাঙালী হইলেও তাহাদের ভাষা বাংলা নহে; মূর্খতার সহিত প্রমত্ততার এমন মিলন কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব নবধর্ম্ম যেমনই হউক, তাহা যে আমাদের সমাজের কোন অংশে এখনও স্বীকৃত হয় নাই, এমন কথা বলিলে অযথার্থ হইবে না। এইজন্যই একালের সাহিত্যেও, বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যে যুগ, সে যুগ এখনও নিঃশেষ হয় নাই; সেই আদর্শেরই যতটুকু রূপান্তর সম্ভব ও স্বাভাবিক তাহাই হইয়াছে; এবং সেই খাঁটি বাংলা সাহিত্যে অশীতিপর বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ এখনও ভাব ও রূপের নব নব ভঙ্গি যোজনা করিতেছেন; গদ্যে ও পদ্যে তাঁহার নিত্যজীবী প্রতিভার যে চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে—নবীনতা ও সজীবতায়, বুদ্ধির প্রখরতায় ও কল্পনার চারুতায়, তাহা যেমন চমকপ্রদ তেমনই অনন্যসুলভ। এখনও যে বাণী সত্য ও শুভ, সুন্দর ও সহজ—যাহা প্রবুদ্ধ করে, আশ্বস্ত করে, অবিশ্বাসের আত্মঘাত হইতে রক্ষা করে, তেমন বাণী রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেই উচ্চারিত হইতেছে; একমাত্র তিনিই, এখনও পর্য্যন্ত বাংলা ভাষা ও বাঙালীর সাহিত্যকে যুগোপযোগী রূপ দান করিয়াও তাহার জাতি-কুল বজায় রাখিয়াছেন।

এ হেন যুগান্তর-জীবী কবি ও মনীষীর একাশীতিতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আজ আমরা আনন্দোৎসব করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী হইয়াছেন, কেবল ইহাই আমাদের আনন্দের কারণ নহে; তিনি কেবল বাঁচিয়া আছেন বলিয়াই আমরা সুখী নহি। অধুনা বিরল হইলেও, আমাদের দেশে ও বিদেশে, সুদীর্ঘ জরাভার বহন করিয়া অনেক গণ্য ও নগণ্য পুরুষ কেবলমাত্র দীর্ঘজীবনের মহিমা লাভ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবন-মহিমা সেইরূপ মহিমা নয়—এ মহিমা জগতের ইতিহাসে অল্প কবির জীবনে ঘটিয়াছে। অন্তত পনরো বৎসর বয়স

হইতে আজ এই আশি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, অর্থাৎ পূর্ণ পঁয়ষট্টি বৎসর ধরিয়া, এই যে নিরলস সাহিত্য-সাধনা, ইহা আর কোন কবির জীবনে দেখা যায় নাই। এই সাধনার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত এমন কোন কাল নাই—এমন একটি বৎসর নাই, যাহাতে কবির সৃজনী প্রতিভার নিত্যধারায় বাংলা সাহিত্যের বহু উষর ভূমি পল্লবে প্রসূনে ফলে ভরিয়া উঠে নাই। 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় একদিন যাহার আরম্ভ হইয়াছিল এখনও তাহার শেষ নাই, আজিকার পত্রিকাগুলিতেও সেই ধারা তেমনই বহিতেছে। সৃষ্টির এই যে নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ, ইহার উৎসের কথা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। যে মানস হইতে ইহার উৎসার, তাহার জরা নাই; স্রোতের এক ধারা মন্দীভূত না হইতেই আর এক ধারায় তাহা সঞ্জীবিত হইয়াছে, ক্রমান্বয়ে নব নব তরঙ্গক্ষেপে সেই উৎস উছলিয়া উঠিয়াছে। আজিও, কবির দেহই জরাজীর্ণ ও রোগজর্জ্জর হইয়াছে, কিন্তু মন যেমন সজীব তেমনই সপ্রতিভ।

অতএব অশীতি বৎসরের পূর্ণ বার্দ্ধক্যভার কবিকে পীড়িত করিলেও, আমাদের নিকটে সে হিসাব অন্যরূপ; কবি বৃদ্ধ হইয়াছেন, এ কথা বলিবার অধিকার আমাদের নাই। আজ তাঁহার জন্মদিনে আমরা তাঁহার প্রতিভার চিরযৌবনের জয়গান করিতেছি। জানি, তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়াছে, রোগ ও জরা একসঙ্গে আক্রমণ করিয়া তাঁহার দেহকে বড় দুঃখ দিতেছে—সে লাঞ্ছনা কবির আত্মমর্য্যাদাকেও যেন আঘাত করিতেছে, তাই তাঁহার নিত্যস্ফূর্ত্ত স্বাধীন মুক্ত আত্মা নিজের এই দীর্ঘ আয়ুকে ধিক্কার দিতেছে। তথাপি আমরা আনন্দ করিতেছি, তাঁহার দীর্ঘতর আয়ু কামনা করিতেছি, তার কারণ, বাঙালীর আজ বড় দুর্দ্দিন, এ দুর্দ্দিনে তিনি বাঁচিয়া আছেন মনে করিয়াও আমরা কতকটা ভরসা পাই। জরা তাঁহাকে জয় করিতে পারিবে না, ইহা আমরা জানি;

জীবনের প্রান্ত-সীমায় পৌঁছিলেও তাঁহার মত জীবিত আমাদের মধ্যে আর কেহ নাই, ইহাও বিশ্বাস করি; এজন্য জরা বা বার্দ্ধক্যের ভয় আমরা করি না। কেবল এই আশা ও কামনা করি যে, তিনি রোগমুক্ত হইয়া, ঝটিকাক্ষুব্ধ নিশীথে একমাত্র প্রদীপের মত, আমাদের গৃহতল আলোকিত করুন। বাংলা দেশে আজ আর কোথাও কোন স্তম্ভ নাই, কোন আলোক নাই; এ যুগের বাঙালীর মত এমন আত্মপ্রবঞ্চিত, আত্মঘাতী, বুদ্ধিহত নির্ব্বীর্য্য জাতি আর নাই। জীবনের কোন ক্ষেত্রে নূতন কিছু অর্জ্জন করিবার যোগ্যতা তাহার নাই, পৈত্রিক যাহা কিছু ছিল এতদিন তাহারই অপচয় করিয়া সেই পিতৃগণকে সে পরিহাস করিয়াছে। যে সর্ব্বনাশকে সে নিজেই ডাকিয়া আনিয়াছে, সেই সর্ব্বনাশ আজ যখন কালান্তক মূর্ত্তিতে একেবারে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত, তখনও তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি বা শুভবুদ্ধি নাই; সৃষ্টির পরিবর্ত্তে অনাসৃষ্টি, জীবনের পরিবর্ত্তে মৃত্যু, ত্যাগের পরিবর্ত্তে অতি নীচ আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে—'শবলুব্ধ গৃধ্রদের উর্দ্ধস্বর বীভৎস চীৎকারে' দেশ ভরিয়া উঠিয়াছে। জাতির শিক্ষাকে পর্য্যন্ত যাহারা কলুষিত করিয়াছে, সেখানেও আত্মপ্রাধান্যের কূটনীতিই যাহাদের একমাত্র সাধনীয়, যাহাদের কুবিধি ও কু-অভিসন্ধির ফলে গত দুই পুরুষ ধরিয়া বাঙালী-সন্তান মূর্খতা ও বিদ্যাবত্তার প্রভেদ ভুলিয়াছে, এবং যাহার পরোক্ষ প্রভাবে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের আজ মৃত্যুদশা উপস্থিত, তাহারাও রাষ্ট্রঘটিত দুর্য্যোগের সুযোগ বুঝিয়া জাতির পরিত্রাতা সাজিতেছে! যাহাদের জীবনে ও চরিত্রে—সত্য, ধৃতি, ক্ষমা বা অলোভ ইহার কোনটাই নাই, তাহারাই যখন সমাজের নেতৃত্ব দাবি করিতেছে, এবং সে দাবিও গ্রাহ্য হইতেছে, তখন এ সমাজ আর বাঁচিবে কয় দিন? আসন্ন বিনাশের আশঙ্কায় দিশাহারা, নিত্য ও নৈমিত্তিক বিপদে

মুহ্যমান—এ জাতির জনসাধারণের প্রাণশক্তি লোপ পাইয়াছে, নহিলে প্রত্যক্ষ পাপ ও অনাচারে তাহারা এমন উদাসীন হইয়া থাকিত না। যে পূজ্য তাহার পূজা নাই, যে বিশ্বাসী তাহাকে বিশ্বাস নাই—ধূর্ত্তকে বিশ্বাস করিয়া, অবরেণ্যকে বরণ করিয়া, আর্ত্তনাদ ও কোলাহল করিতে করিতে আজ আমরা নিশ্চিত বিনাশের মুখে অন্ধবেগে ছুটিয়া চলিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ এ সমাজের কেহ নহেন, ইহারা তাঁহাকে কতটুকু শ্রদ্ধা করে তাহা তিনি জানেন—সেটুকু শ্রদ্ধাও আর কতদিন তাহাদের পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব হইবে, তাঁহার মত ব্যক্তিকে তাহাদের আর কি প্রয়োজন থাকিতে পারে, বোধ হয় ইহাই চিন্তা করিয়া তিনি সেই মর্ম্মান্তিক কথা বলিয়াছেন যে, দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকার মত ধৃষ্টতা আর নাই। তাঁহার এই উক্তি আমি আজ কেবলই স্মরণ করিতেছি, এবং ভাবিতেছি, সে কি তাঁহার লজ্জা, না আমাদেরই? বিধাতা এক্ষণে বাঙালীর উপরে বড়ই বিরূপ, তথাপি রবীন্দ্রনাথের মত পুরুষের মুখে এই উক্তি যে আমাদেরই কত বড় দুর্ভাগ্যের প্রমাণ, তাহা যেন আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। বাঙালীর সাহিত্যে, বাঙালীর সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথ যাহা দিয়াছেন, তাহার অর্দ্ধেক দিলেও আমরা ধন্য হইতাম, সে পক্ষে আমাদের আর একটুও দাবি নাই। কবি যদি আজ তনুত্যাগের পূর্ব্বে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাহা হইলেও আমাদের লেশমাত্র অনুযোগ করিবার কারণ নাই—সেই 'অকূল শান্তি ও বিপুল বিরতি'র অধিকার তাঁহার যেমন আছে তেমন আর কাহারও নাই—জগতের কোন কবিরই ছিল না। তথাপি আজ এই অশীতিবর্ষ পূর্ণ হওয়ার দিনেও আমরা যে তাঁহার দীর্ঘতর জীবন কামনা করি, তার কারণ, যতদিন তিনি বাঁচিবেন ততদিন বাঙালীর কুল-মান বজায় থাকিবে; তাহার পর কি হইবে বিধাতাই জানেন।* শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

* ২৫ বৈশাখ, ১৩৪৮ হাওড়া-সঙ্ঘ-পাঠাগারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত, রবীন্দ্র-জন্মদিবস-উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ।

বাংলা ছন্দ ও মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৫

গীতিচ্ছন্দের পর্ব্ব ও পয়ার-ছন্দের পদ এই দুইয়ের প্রকৃতি ও প্রভেদ একটু বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিবার সময় আসিয়াছে। আমি প্রথমেই পর্ব্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব। পদ ও পর্ব্বের পার্থক্য কানে অতি সহজেই ধরা পড়িবে, যথা—

বসন্ত নবীন
সেদিন ফিরিতেছিল ভুবন ব্যাপিয়া
প্রথম প্রেমের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া—

এই পদভূমক পংক্তিগুলিকে যদি এমন ভাবে সাজানো যায়—

নব বসন্ত সেদিন ফিরিতেছিল
ভুবন ব্যাপিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া
প্রথম প্রেমের মত—

—তাহা হইলে স্পষ্ট অনুভব করা যাইবে, এবারে এক নূতন ধরনের ঝোঁক পংক্তিগুলিকে নূতনভাবে স্পন্দিত করিতেছে। প্রথম পংক্তি-গুলির উচ্চারণে শব্দগত ঝোঁকের যে তারতম্য আছে, তাহা আমাদের কানে ছন্দেরই একটা বৈশিষ্ট্য বলিয়া অনুভূত হয় না, তাহাতে কোন নিয়মিত পর্য্যায়ও নাই; কিন্তু এই শেষের পংক্তিগুলির শব্দসজ্জায় একটা নিয়মিত ঝোঁক এবং তজ্জনিত ছন্দস্পন্দ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এবং দেখা যাইতেছে, তাহার মূলে আছে তিন বা ছয় মাত্রার ধ্বনিভাগ—

নব বসন্ত • সেদিন • ফিরিতে • ছিল
ভুবন ব্যাপিয়া • কাঁপিয়া • কাঁপিয়া
প্রথম • প্রেমের • মত…

ত্রৈমাত্রিক ছন্দে এই তিন ও ছয় মাত্রার পর্ব্বচ্ছেদের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; এক্ষণে এই ছন্দের মূলীভূত ঝোঁক (Stress বা ঠেস) ও তদনুযায়ী পর্ব্বের গঠন এবং ছন্দস্পন্দের বৈচিত্র্যের কথা বলিব। সাধারণত প্রত্যেক পর্ব্বে একটিমাত্র ঝোঁকই যথেষ্ট—যেখানে প্রতি তিন মাত্রায় পৃথক ঝোঁক থাকে, সেইখানে তিন মাত্রার পর্ব্বই পাওয়া যায়; কিন্তু সচরাচর ছয় মাত্রায় একটি ঝোঁকই থাকে—এবং এই ঝোঁকের উপরেই পর্ব্বচ্ছেদ ও নিয়মিত ছন্দস্পন্দ নির্ভর করে। তিন মাত্রার পর্ব্ব যেমন পৃথক ঝোঁকের জন্যই ঘটে, তেমনই বিশেষ যত্ন ও কৌশলের দ্বারাও সেইরূপ পর্ব্ব রচনা করা যায়। তিন বা দুই মাত্রার মিশ্র পর্ব্বেও ঝোঁক একটাই, অতএব এমন নিয়ম নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, এক একটি ঝোঁকেই এক একটি পর্ব্ব, এবং তাহারই নিয়মিত পর্য্যায়গুণে গীতিচ্ছন্দের বিশিষ্ট ধ্বনিতরঙ্গ উৎপন্ন হয়। ইহার প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে পাওয়া যাইবে।

দ্বৈমাত্রিক (২+২)

মহাঋষি • গাহিলেন • বিকলিত • বচনে (হেমচন্দ্র)

* * *

শোন সখি • গায় কারা • আজ রাতে • গুজরাতি • গরবা (সত্যেন্দ্রনাথ)

ত্রৈমাত্রিক (৩+৩)

ভূতের মতন • চেহারা যেমন • নির্ব্বোধ অতি • ঘোর (রবীন্দ্রনাথ)

মিশ্র (৩+২)

নন্দপুর • চন্দ্র বিনা • বৃন্দাবন • অন্ধকার (কালিদাস)

সাত মাত্রার মিশ্র পর্ব্ব হইলে পর্ব্বমধ্যে দুইটি ঝোঁকই পড়ে, যথা—

খাঁচার+ফাঁকে ফাঁকে • পরশে+মুখে মুখে

নীরবে+চোখে চোখে • চায় (রবীন্দ্রনাথ)

এখানে নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে—কিন্তু আসলে এখানে পর্ব্বের মাত্রাপরিমাণ অতিরিক্ত বলিয়াই পর্ব্বটি যুগ্মপর্ব্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তথাপি উহা এক একটি গোটা পর্ব্বই বটে—পদ-ভাগ বা ছন্দ-ভাগ নহে; ইহারা যেন দুই-কুঁজওয়ালা উটের মত দুই-ঝোঁকওয়ালা পর্ব্ব।

ত্রৈমাত্রিক ছন্দ সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের মীমাংসা এখনও বাকি আছে। আমি বলিয়াছি, এই ছন্দের পর্ব্ব তিন মাত্রার হইলেও, সাধারণত উহা পুরা ছয় মাত্রার, অর্থাৎ (৩+৩)-এর যুক্ত পর্ব্ব হইয়া থাকে। ইহার কারণ, এক একটি ঝোঁকেই এক এক পর্ব্ব হয়; যেখানে ছয় মাত্রায় একটি ঝোঁকই প্রধান, সেখানে পর্ব্বও একটা হয়; আবার যেখানে, কোন কারণে, প্রত্যেক তিন মাত্রায় স্বতন্ত্র ঝোঁক পড়ে, সেখানে পর্ব্ব দুইটি যুক্ত না হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, যথা—

বাসর-শয়ন • করেছি রচন • কুসুম থরে

এখানে পৃথক তিন মাত্রার পর্ব্ব নাই, ছয় মাত্রার যুক্ত পর্ব্বই আছে; তার কারণ, কোনটাতে একটার বেশি ঝোঁক নাই। কিন্তু—

সেই মুকুল-আকুল বকুল-কুঞ্জ ভবনে

এখানে পর্ব্বগুলি এক একটি সমাসবদ্ধ পদ হইলেও, মিল ও অনুপ্রাসের খাতিরে, দ্বিধাবিভক্ত হইয়া প্রত্যেক তিন মাত্রায় পৃথক ঝোঁক পাইয়াছে; এজন্য, পর্ব্বগুলিকে ছয় মাত্রার না ধরিয়া তিন মাত্রার ধরাই উচিত, যথা—

সেই মুকুল •-আকুল • বকুল •-কুঞ্জ • ভবনে

কিন্তু ইহা অপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন আছে। এই ছয় মাত্রার পর্ব্বেই অনেক সময়ে দ্বৈমাত্রিক ভাগ লক্ষ্য করা যায়—একই ছন্দে পর্ব্বের গঠন ৩+৩-এর পরিবর্ত্তে ৪+২ কিম্বা ২+৪ হইয়া থাকে, যথা—

সঘন • বরষা • গগন • আঁধার

এই খাঁটি ত্রৈমাত্রিক ছন্দের দ্বিতীয় চরণটি এইরূপ—

হের বারিধারে • কাঁদে চারিধার

আবার পূর্ব্বোদ্ধৃত 'বাসর-শয়ন করেছি রচন'-এর পূর্ব্বের চরণটির গঠনও এইরূপ, যথা—

নিশিদিন তাই • বহু অনুরাগে
(বাসর-শয়ন • করেছি রচন
কুসুম থরে)

এসকল স্থানে ৩+৩-এর পরিবর্ত্তে ২+৪ কিম্বা ৪+২-এর মত গঠন দেখা যায়। এক্ষণে ইহার ব্যাখ্যা কি হইতে পারে তাহাই বলিব। ইহারা যে দ্বৈমাত্রিক চরণ নয় তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ তাহা হইলে, ৪+২-এর ভাগে, গীতিচ্ছন্দ অনুসারে প্রথম চার মাত্রায় একটি ঝোঁক, এবং শেষের দুই মাত্রায় আর একটি থাকিবার কথা, যেমন—

এনে দেব • চুল-বাঁধা / রাঙা ডোর • প্রিয়া ('ঘাসের ফুল')

—ইহার শেষের ছয় মাত্রার ছন্দভাগ দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। আবার, ২+৪—এরূপ পর্ব্বচ্ছেদ দ্বৈমাত্রিক গীতিচ্ছন্দের স্বভাব নয়। পয়ার-ছন্দের দ্বৈমাত্রিক লয়ও ইহাতে নাই, কারণ তাহার ছন্দপ্রবাহই অন্যরূপ, যথা—

কি যাতনা বিষে / বুঝিবে সে কিসে / কভু আশীবিষে / দংশেনি যারে (কৃষ্ণচন্দ্র)

এ ঝোঁকগুলি পর্ব্ব-স্পন্দের ঝোঁক নয়—ইহাদের একটাও Rhythmical accent নয়। এ ছন্দে পর্ব্বসুলভ গতি-বেগ নাই, বরং পদান্ত-যতির জন্য পদের যেটুকু গতিরোধ হয় তাহাতে ঝোঁকগুলির ধাক্কা সামলাইয়া যায়, সেজন্য পদমধ্যে দ্বৈমাত্রিক বা ত্রৈমাত্রিক পর্ব্বচ্ছেদের মত কিছু ঘটে না—ঝোঁকগুলি যেন সমস্ত পদ জুড়িয়া পরস্পরের মধ্যে একটা সমতা রক্ষা করে; এবং এইজন্যই, কেবল উচ্চারণ-রীতির বশে দুইটি ঠেস

পড়ে, তাহার মধ্যে কোনটি Rhetorical বা ভাব-অর্থঘটিত স্বরবৃদ্ধি হইতেও পারে। কিন্তু ত্রৈমাত্রিক পর্ব্বের এই ৪+২ বা ২+৪ গঠনেও ঝোঁক একটিই, যথা—

করিলাম বাসা • মনে হল আশা

* * *

এ জগতে হায় • সেই বেশি চায় • আছে যার—ভূরি ভূরি

[এখানেও লক্ষ্য করা যাইবে যে, 'আছে যার ভূরি ভূরি' এই (৬+২)-এর ছন্দভাগ, Rhythmical variation-এর জন্য, দুইটি চার-মাত্রার দ্বৈমাত্রিক পর্ব্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।]

অতএব, এই যে একটিমাত্র ঝোঁক প্রধান হইয়া উঠা, এবং তজ্জন্য পর্ব্বমধ্যে আর কোনরূপ ছেদের অবকাশ না থাকা—ইহার জন্যই, গঠন যেমনই হউক, এইরূপ পর্ব্বও ছয় মাত্রার ত্রৈমাত্রিক পর্ব্বই বটে; অর্থাৎ, ইহাও ত্রৈমাত্রিক লয়যুক্ত হয়। আমি পূর্ব্বে পয়ার-ছন্দের ছয় মাত্রার পদে, ত্রৈমাত্রিক পদচ্ছেদ সত্ত্বেও, দ্বৈমাত্রিক লয়ের কথা বলিয়াছি।

এই ঝোঁক ও তজ্জনিত নিয়মিত পর্ব্বপর্য্যায়ই গীতিচ্ছন্দকে পয়ার ছন্দ হইতে অতিশয় বিলক্ষণ করিয়া তুলিয়াছে। আমি পদ ও পর্ব্বের পার্থক্যবিচার পরে করিতেছি, তৎপূর্ব্বে গীতিচ্ছন্দের পর্ব্বগত ঝোঁকের স্থান-পরিবর্ত্তনে ছন্দতরঙ্গের যে লীলাবৈচিত্র্য ঘটে, তাহার পরিচয় দিব। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এই পর্ব্বগত ঝোঁক, আমাদের সাধারণ উচ্চারণ-রীতির বশে পর্ব্বের আদ্য অক্ষরকেই আশ্রয় করে, এবং তাহাতেই সেই ঝোঁকগুলি নিয়মিতভাবে Rhythmical বা ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া থাকে—ভাব, অর্থ, অথবা বাক্যের অন্বয়মূলক হইবার অবকাশ থাকে না। কিন্তু এইরূপ রীতিমত বা বিধিবদ্ধ ঝোঁক-বিন্যাস কবিতার ছন্দ-

সুষমার পক্ষে প্রয়োজনীয় হইলেও তাহাতে ভাব অর্থ ও কল্পনার গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়, ভাবৈশ্বর্য্যহীন কৃত্রিমতাই প্রশ্রয় পায়। ভাবচ্ছন্দের সহিত কাব্যচ্ছন্দের মিল না হইলে কোন কবিতাই কবিতা হয় না; এবং বিধি-বদ্ধ হইলেও ছন্দের স্বাচ্ছন্দ্যই উৎকৃষ্ট ছন্দসঙ্গীতের লক্ষণ—বৈচিত্র্যের মধ্যেই যে ঐক্য, তাহাই সকল বৃহত্তর সঙ্গতির মূল। এই Rhythmical variation বা ছন্দের স্পন্দন-বৈচিত্র্য সকল শ্রেষ্ঠ কবির কবিতায় প্রচুর পরিমাণে মিলিবে। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথের কাব্যচ্ছন্দে ছন্দস্পন্দের যে বৈচিত্র্য আছে, তাহা অনুকরণকারীদের অনেকের কবিতায় নাই; এইজন্যই, এক দিকে যেমন ছন্দোদোষদুষ্ট কবিতা অশ্রদ্ধার উদ্রেক করে, তেমনই, ছুতার-মিস্ত্রির মাপ-ঠিক-রাখা ছন্দে কবিতা রচনা করিলে, সে কবিতায় সত্যকার কাব্যপ্রেরণার অভাব তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে। প্রাচীন ক্লাসিক্যাল ছন্দবিধির সুকঠিন ছাঁচ আধুনিক কাব্যের পক্ষে অচল; ভাবের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া, প্রাণ ও কান দুইয়েরই সহযোগে ছন্দকে—কাব্যের বহিরঙ্গ নয়—অন্তরঙ্গরূপে পরিণত করিয়া, এ বিষয়ে যে নব্য ছন্দ-রীতির প্রবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতেও কাব্যের মুক্তিলাভ হইয়াছে। নিয়মিত ও অনিয়মিত দুই প্রকার ঝোঁক ও তজ্জনিত পর্ব্বচ্ছন্দের বৈচিত্র্য দেখাইবার জন্য আমি কয়েকটি পদ্যপংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। নিয়মিত ঝোঁকের দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেও দিয়াছি, যথা—

নন্দপুর • চন্দ্র বিনা • বৃন্দাবন • অন্ধকার
(কালিদাস)

নিত্য তোমায় • চিত্ত ভরিয়া • বরণ করি (রবীন্দ্রনাথ)

মর্ম্মে যবে • মত্ত আশা • সর্পসম • ফোঁসে (রবীন্দ্রনাথ)

আবার • ধীরে ধীরে • গেল ফিরে • আলসে ('ছন্দ'—রবীন্দ্রনাথ)

কিন্তু পরের গুলিতে এমন নিয়মিত ঝোঁক পড়িবার প্রয়োজন নাই—

করিলাম বাসা • মনে হল আশা • আরামে দিবস • যাবে (রবীন্দ্রনাথ)

চমকি উঠিল • শুনি কিঙ্কিণী • চাহিয়া দেখিল • দ্বারে (রবীন্দ্রনাথ)

তোর তারালোক হতে • পরী-বিহঙ্গী • পাখা মেলে উড়ে • আয় (যতীন্দ্রমোহন)

[এখানে 'পাখা মেলে উড়ে আয়' এই ছন্দভাগটি, ঝোঁকের স্থানপরিবর্ত্তনের ফলে, দুইটি চার-মাত্রার পর্ব্বের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে—আসলে উহা ত্রৈমাত্রিক ৬+২। 'বিহঙ্গী'তে যুক্তাক্ষরের পূর্ব্বে একটু ঝোঁক পড়ে।]

আবার—

এমন+দিনে তারে • বলা যায়

এমন+ঘনঘোর • বরিষায়

এমন+মেঘস্বরে • বাদল+ঝরঝরে

তপন+হীন ঘন • তমসায় (রবীন্দ্রনাথ)

ইহার পর্ব্বগুলির নিয়মিত ঝোঁক, পাঠকের রুচি বা ভাবগ্রাহিতা অনুসারে, স্থানান্তরিত করিলেও ক্ষতি হয় না, যথা—

এমন দিনে (তারে) বলা যায়

(এমন) ঘনঘোর বরিষায়

(এমন) মেঘস্বরে (বাদল) ঝরঝরে

তপনহীন (ঘন) তমসায়।

এখানে দুই কারণে ঝোঁকের স্থান বদল হইয়াছে, প্রথম—বন্ধনী দেওয়া শব্দগুলিকে Hypermetric-এর মত পড়িয়া পরবর্ত্তী শব্দের ঝোঁক প্রবল করার জন্য; দ্বিতীয়—শব্দবিশেষের ভাব-অর্থের উপরেই জোর (rhetorical) দেওয়ার জন্য। পাঠকের নিজ ভাব ও রুচি

অনুযায়ী পাঠভঙ্গির জন্য, ছন্দ বজায় রাখিয়াই, ছন্দস্পন্দের বৈচিত্র্য ঘটানো যেমন সম্ভব, তেমনই আরও কয়েকটি কারণে ছন্দের তরঙ্গলীলা বা স্পন্দবৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে—

(১) পর্ব্বের মধ্যে বা অন্তে যুক্তাক্ষর থাকিলে ঝোঁকের স্থান বদল হয়, যথা—

কোঁথা গেল সেই • মহান শান্ত

নব নির্ম্মল • শ্যামল কান্ত

উজ্জ্বল নীল • বসন প্রান্ত

সুন্দর শুভ • ধরণী। (রবীন্দ্রনাথ)

চমকি উঠিল • শুনি কিঙ্কিণী

চাঁহিয়া দেখিল • দ্বারে (রবীন্দ্রনাথ)

উপরের পর্ব্বগুলি ত্রৈমাত্রিক ছয় মাত্রার পর্ব্ব, প্রত্যেক পর্ব্বে প্রধান ঝোঁক একটাই—এইগুলিতে আমি ডবল চিহ্ন দিয়াছি। অপর ঝোঁক-গুলি অপ্রধান—তাহাতে যে চিহ্ন দিয়াছি তাহা না দিলেও চলে; তথাপি সূক্ষ্ম হিসাবের খাতিরে তাহা দিয়াছি, অন্যত্র দিব না। পাঠককে এই প্রধান ঝোঁকগুলিই সর্ব্বদা লক্ষ্য করিতে বলি, তাহাতে ছন্দকে কানে আরও ভাল করিয়া বাজাইয়া লইবার সুবিধা হইবে।

(২) যুক্ত স্বর বা diphthong-ও ঐ এক কাজ করিয়া থাকে, যথা—

একি কৌতুক • নিত্য নূতন • ওগো কৌতুকময়ী (রবীন্দ্রনাথ)

* * *

জলসিঞ্চিত • ক্ষিতি-সৌরভ • রভসে (ঐ)

(৩) পর্ব্বগত মিল বা অনুপ্রাসের জন্যও ঝোঁকের স্থান পরিবর্ত্তন হয়, এবং ছন্দস্পন্দের বৈচিত্র্য ঘটে, যথা—

বাজে পূরবী-র • ছন্দে রবি-র

শেষ রাগিণী-র • বীণ (রবীন্দ্রনাথ)

[এখানে প্রতি পর্ব্বে দুইটি ঝোঁকই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে—মধ্য-মিল বা অনুপ্রাসের বাজনা না বাজাইয়া উপায় নাই। এই দ্বিতীয় ঝোঁকগুলির প্রকৃতি কিন্তু স্বতন্ত্র।]

অথবা—

হের বারিধারে • কাঁদে চারিধার (রবীন্দ্রনাথ)

(৪) একই ত্রৈমাত্রিক ছন্দে যুক্ত ও অযুক্ত পর্ব্ব থাকায় ঝোঁকের স্থান সমান নিয়মিত হইতে পারে না, যথা—

গুরু গুরু মেঘ • গুমরি • গুমরি,

গরজে • গগনে • গগনে (রবীন্দ্রনাথ)

* * *

না মানে • শাসন • বসন • বাসন • অশন • আসন • যত (রবীন্দ্রনাথ)

উপরি-উদ্ধৃত উদাহরণ দুইটির প্রথমটিতে ধ্বনির খাতিরে, ও দ্বিতীয়-টিতে অর্থের খাতিরে, তিন মাত্রায় পৃথক ঝোঁক পড়িয়াছে। অর্থের খাতিরে ঝোঁক—যাহাকে ইংরেজীতে Rhetorical accent বা Emphasis বলা হয়—খাঁটি গীতিকবিতার ছন্দ-প্রবাহে আবশ্যক হয় না; সেখানে সকল ঝোঁকই Rhythmical বা ছন্দানুবর্ত্তী হইলে ভাল হয়। কিন্তু গাথা বা কাহিনী (Epic বা Narrative) কবিতায় এইরূপ ভাব বা অর্থঘটিত ঝোঁক প্রায় আসিয়া পড়ে, যথা—

দরজার পাশে • দাঁড়িয়ে সে হাসে / দেখে জ্বলে যায় • পিত্ত (রবীন্দ্রনাথ)

এখানে যে দুইটি স্থানে ডবল-চিহ্ন দিয়াছি—তাহা Rhythmical

accent নয়—Rhetorical accent বা Emphasis। তথাপি এই ঝোঁকের স্থান-পরিবর্ত্তন এত সহজে ঘটে যে, খাঁটি গীতি-কবিতাতেও এইরূপ পরিবর্ত্তন অসঙ্গত নহে, যথা—

ওই মন উদাসীন • ওই আশাহীন
ওই ভাষাহীন • কাকলি (রবীন্দ্রনাথ)

এমন ভাবেও পড়া যায়—

ওই মন উদাসীন • ওই আশাহীন
ওই ভাষাহীন • কাকলি

ইহার কারণ অবশ্য ওই মিলের অনুপ্রাসই বটে।

পর্ব্বভূমক গীতিচ্ছন্দে এই যে ঝোঁকের সৃষ্টি হয়, ইহা আদৌ পর্ব্বের গঠনে মাত্রার একটা বিশেষ হিসাবের জন্য ঘটিলেও, হসন্তবর্ণ ও যুক্ত-বর্ণের বিন্যাস-কৌশলে এই ঝোঁকের অনেক তারতম্য ঘটে। সাধুভাষার প্রকৃতি স্বরধ্বনি-প্রধান বলিয়া, এই ঝোঁক সত্ত্বেও তাহাতে পয়ারের মত যে মন্থর গতি-বেগ সম্ভব সে সম্বন্ধে পরে বলিব। এক্ষণে এই হসন্ত ও যুক্তবর্ণের জন্য ইহাতে ছন্দস্পন্দের যে বৈচিত্র্য সাধারণত ঘটিয়া থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত দিব। যুক্তাক্ষরের অভাবহেতু ত্রৈমাত্রিক চরণের যে ছন্দস্পন্দ তাহা এইরূপ—

অনিমেষ তারা নিবিড় নিশায়,
লহরীর লেশ নাহি যমুনায়,
জনহীন পথ আঁধারে মিশায়,
পাতাটি কাঁপে না গাছে। (রবীন্দ্রনাথ)

ইহার সহিত নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলির ছন্দস্পন্দের তুলনা করিলে যুক্তাক্ষরের প্রভাব বুঝিতে পারা যাইবে—

ভক্ত-দেহের রক্ত-লহরী মুক্ত হইল কি রে!
বীরগণ জননীরে…
রক্ততিলক ললাটে পরালো পঞ্চনদীর তীরে (রবীন্দ্রনাথ)

দ্বৈমাত্রিক ছন্দের একটি যুক্তাক্ষরবর্জ্জিত চরণ এইরূপ—

বিভূতির • বিভা ছায় • সারাদেহে • হোথা কার (সত্যেন্দ্রনাথ)

ইহার সহিত তুলনীয় ঐ একই ছন্দের—

বজ্রেরি • তূর্য্যে এ • গর্জ্জেছে • কে আবার (নজরুল ইসলাম)

মিশ্র পর্ব্বের যুক্তাক্ষরহীন চরণের ছন্দস্পন্দ, যথা—

কুসুম রথে • মকরকেতু • উড়িত মধু • পবনে (রবীন্দ্রনাথ)

এবং যুক্তাক্ষরের প্রভাবে তাহার আর এক রূপ—

নন্দপুর • চন্দ্র বিনা • বৃন্দাবন • অন্ধকার

[মিশ্রপর্ব্বে দুই জাতীয় পর্ব্ব থাকে বলিয়া, ৩+২-এর প্রতি ভাগে একটি করিয়া পৃথক ঝোঁক পড়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রথম পর্ব্বে যুক্তাক্ষর থাকায়, এমন একটি প্রবল ঝোঁক পড়ে যে, তাহার জন্য দ্বিতীয় পর্ব্বের ঝোঁক লুপ্ত হইয়া যায়; তাই এই পাঁচ মাত্রার পর্ব্বে একটি ঝোঁকই প্রধান হইয়া উঠে। পর্ব্বমধ্যস্থ হসন্তবর্ণের ফলেও এইরূপ ঝোঁকের সৃষ্টি হয়, যথা—

ধম্‌কে দিয়ে • চম্‌কে চেয়ে • থম্‌কে গেল • তক্ষুনি ('ঘাসের ফুল')

'নন্দপুর • চন্দ্র বিনা—' এই কারণে, পাঁচ মাত্রায় একটিমাত্র ঝোঁক পাইয়াছে, কিন্তু—

কুঁসুম+রথে • মকর+কেতু • উড়িত+মধু • পবনে

—দুই ভাগে দুই ঝোঁক রক্ষা করিতেছে। ইহার কারণ, যেমন যুক্তাক্ষরের অভাব, তেমনই প্রত্যেক বর্ণ স্বরান্ত হওয়াতেও উহার ৩+২ পর্ব্বভাগ স্পষ্ট হইয়া উঠে, এবং সেইজন্য দুইটিতেই ঝোঁক পড়ে। 'এমন মেঘস্বরের বাদল ঝরঝরে • তপনহীন ঘন তমসায়'—এখানেও প্রত্যেক বর্ণ স্বরান্ত হইলে ছন্দটি ঠিকমত বাজিয়া উঠে। কিন্তু পর্ব্বের এইরূপ গঠনে ছন্দস্পন্দের বৈচিত্র্য ঘটে না—সংস্কৃত ছন্দের মত একঘেয়ে হইয়া উঠে।]

শুধু ঘন ঘন যুক্তাক্ষর-বিন্যাসই নয়—পর্ব্বান্ত হসন্তবর্ণ যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করিতে পারিলে, স্বর-প্রসারণের কোন অবকাশ আর থাকে না বলিয়া, এই বাংলা ছন্দেও প্রবল আঘাত-মূলক ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি করা যায়, যথা—

ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন (নজরুল ইসলাম)

ইহা পড়িতে হইবে এইরূপ—

ওরে হৃত্যা-নর্য়াজ • র্স-ত্যা-গ্রহ • শক্তি-রূঘো • ধন্

ইহার কোনখানে স্বর-প্রসারণের অবকাশমাত্র নাই।

উপরের দৃষ্টান্তগুলি হইতে, বাংলা গীতিচ্ছন্দে ঝোঁকের তারতম্য, ও তাহার মূলে হসন্ত, স্বরান্ত, ও যুক্ত বর্ণের যে প্রভাব আছে, তাহার সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হইবে।

আরও যে এক কারণে ছন্দস্পন্দের বৈচিত্র্য ঘটে, এমন কি ছন্দই যেন একটু অন্যরূপ বলিয়া মনে হয়—তাহার কথা বলিব। এই গীতিচ্ছন্দও যে পয়ারের মতই সাধু ভাষার ছন্দ তাহার একটি প্রমাণ—অতিরিক্ত হসন্তের প্রাধান্য ইহার যেন ধর্ম্মহানি করে। সংস্কৃত লঘু-গুরুর নিয়মে বাংলা ছন্দ রচনা করিলে তাহা যেমন একটা কৃত্রিম শিল্প-কর্ম্ম হিসাবেই উপভোগ্য (এজন্য আমি সে জাতীয় ছন্দকে আমার এই আলোচনায় কোন স্থান দিই নাই), তেমনই, এই মাত্রিক পর্ব্বভূমক গীতিচ্ছন্দ হসন্ত-বাহুল্যে এমন এক রূপ ধারণ করে যে, এক হিসাবে তাহা উপভোগ্য হইলেও, সে যেন এক ভাষার ছন্দে আর এক ভাষার কবিতা, যেমন—

দুই বোন তারা • হেসে যায় কেন • যায় যবে জল • আনতে (রবীন্দ্রনাথ)

* * *

ওগো আজ তোরা • যাস্ নে গো তোরা • যাস নে ঘরের • বাহিরে (রবীন্দ্রনাথ)

* * *

ওগো আল্‌তায় লাল • পার তল যার • মঞ্জীর তার • বাজবেই (করুণানিধান)

* * *

ফিস্‌ফিস্ • গুজ্‌গুজ্ • দিন রাত • করছে
ভালমুট • মুঠ্‌মুঠ্ • পেটটায় • ভরছে ('অঙ্গুষ্ঠ')

ছন্দের এই হসন্ত-বিলাস খাঁটি কথ্য বা প্রাকৃত বাংলাতেই সম্ভব—সাধুভাষার ছন্দে ইহার দ্বারা একটা ধ্বনি-সঙ্কর সৃষ্টি হয়। তথাপি

ইহারই সাহায্যে, প্রাকৃত বাংলার এই হসন্ত-ধাতুর সঙ্গে মিলাইয়া বিদেশী শব্দের হসন্তধ্বনিকে বাংলা ছন্দের অনুগত করা গিয়াছে, যথা—

গুগ্‌গুলে মশ্‌গুল্ বিল্‌কুল্ ভর্‌ভর্,
কার ছায়া জ্যোস্‌নায় ?—সুন্দর ! সুন্দর ! ('স্বপন-পসারী')

ছন্দস্পন্দের বৈচিত্র্য ও তাহার কারণ সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব একটি সংক্ষিপ্ত আভাস দিলাম, অনেক সূক্ষ্ম হিসাব ইচ্ছা করিয়াই বাদ দিয়াছি—তাহাতে বিষয়টি সহজবোধ্য না হইয়া জটিল হইয়া উঠিত। এমনই একটা হিসাবের কথা এখনই মনে পড়িল। পূর্ব্বে বলিয়াছি—৩+৪, বা ৪+৩-এর যুক্ত সাত-মাত্রার পর্ব্বে দুইটি করিয়া ঝোঁক পড়ে, তার কারণ, এই পর্ব্ব সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, একটিমাত্র ঝোঁকে ইহার সবটাকে টানিয়া রাখা যায় না। কিন্তু স্থানবিশেষে, ছন্দের বিশেষ প্রভাবে, ৩+২-এর ক্ষুদ্রতর মিশ্র পর্ব্বেও দুইটি ঝোঁক থাকিতে পারে, যথা—

আঁকাশ কোণে • বিকাশে জাগ • রণ

ধরণীতলে • ভাঙেনি ঘুম • ঘোর (রবীন্দ্রনাথ)

এই পাঁচ মাত্রার এক-ঝোঁক-ওয়ালা পর্ব্বও, উপরের ছন্দটিকে পরিবর্ত্তন করিলে, দুইটা ঝোঁক চাহিয়া বসিবে, যথা—

বিকাশে+জাগরণ • আঁকাশ+কোণে

মগন+ঘুমঘোরে • ধরণী+তল

এখানে পরবর্ত্তী পর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী পর্ব্বের ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছে।

৬

গীতিচ্ছন্দের পর্ব্ব হইতে যে কারণে ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি হয়, এবং তাহার তরঙ্গ-লীলার বৈচিত্র্য যে কারণে হয়, তাহা মনে রাখিলে পয়ারের পদ ও এই পর্ব্বের মূলগত প্রভেদ স্পষ্ট বুঝিতে পারা

যাইবে। মাত্রার গণনায় হসন্ত ও যুক্ত বর্ণের একটু পৃথক হিসাব—সেই অনুসারে পর্ব্বচ্ছেদ ও তজ্জনিত ঝোঁক প্রভৃতির কারণে, এই ছন্দ যে পয়ার হইতে স্বতন্ত্র; ইহার মাপ পদ নয়—পর্ব্ব; এবং পদের চাল ও পর্ব্বের চাল যে সম্পূর্ণ ভিন্ন—ইহা আশা করি আর বুঝাইতে হইবে না। তথাপি এ সম্বন্ধে একটি উদাহরণ দিব। রবীন্দ্রনাথ একদা একটি পয়ার-ছন্দের কবিতায় যুক্তাক্ষরকে গীতিচ্ছন্দের ওজন দিয়াছিলেন, ফল হইয়াছিল এইরূপ—

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল।
ঊর্দ্ধে পাষাণতট শ্যাম শিলাতল।
মাঝে গহ্বর তাহে পশি জলধার।
ছল ছল করতালি দেয় অনিবার।

এ ছন্দ, গীতি ও পয়ারের মধ্যস্থলে, অনিশ্চিত পদক্ষেপে দোলায়মান হইয়া আছে—কারণ ইহাকে দুই রকমেই পড়া যায়—

(১) পয়ারের মাত্রা বণ্টন ও পদ-ভাগ অনুসারে, যথা—

নিম্নে যমুনা বহে / স্বচ্ছ শীতল (৮+৬)
ঊর্দ্ধে পাষাণতট / শ্যাম শিলাতল

(২) গীতিচ্ছন্দের পর্ব্বচ্ছেদ অনুসারে, যথা—

নিম্নে যমুনা • বহে / স্বচ্ছশীতল।
ঊর্দ্ধে পাষাণ • তট / শ্যাম শিলাতল। (ত্রৈমাত্রিক)

কিম্বা,

মাঝে গহ্ • বর তাহে • পশি জল • ধার।
ছল ছল • করতালি • দেয় অনি • বার। (দ্বৈমাত্রিক)

প্রথমটিতে যুক্তাক্ষরের জন্য কোন ঝোঁক নাই—কেবল, আট মাত্রার সমান প্রবাহের পরে যতি পড়িয়াছে; ইহাতে একটি পদের সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে ঝোঁকের বশে নিয়মিত ধ্বনিভাগ বা পর্ব্বের সৃষ্টি হইয়াছে।

পর্ব্ব ও পদের প্রসঙ্গে, উভয়ের আর একটি ছন্দোগত পার্থক্যের কথা

এইখানেই উল্লেখ করিব। গীতিচ্ছন্দের যে ছন্দস্পন্দ বা ধ্বনিতরঙ্গের আলোচনা পূর্ব্বে করিয়াছি, তাহাতে আর একটি বস্তুর বিশেষ মূল্য আছে, ইহার নাম—খণ্ডপর্ব্ব, ইহা ছন্দের চরণান্তিক অংশ; ইহাতে যেমন ছন্দের অশেষ বৈচিত্র্যবিধান হয়, তেমনই এই খণ্ডপর্ব্বযোগে গীতিচ্ছন্দের ছন্দভাগও নানা আয়তনের হইয়া থাকে। পয়ারের পদ এইরূপ খণ্ডিত হইতে পারে না—অন্তত আধুনিক পয়ার-জাতীয় ছন্দে কোন পদই—চরণান্তিক হইলেও—খণ্ডপদ নহে; অথচ রবীন্দ্রনাথও (বোধ হয় ছন্দবাগীশদের পাল্লায় পড়িয়া) এ ভুল করিয়াছেন। পয়ারের প্রত্যেক পদই পূর্ণ, কারণ,—প্রথমত, তাহার ছন্দপ্রবাহ ঠেকাইবার জন্য শেষে কোন খুঁটির প্রয়োজন হয় না; দ্বিতীয়ত, তাহার পদগুলি পর্ব্বের মত নির্দ্দিষ্ট গঠন বা নিয়মিত পর্য্যায়ের নহে, এজন্য খণ্ডতার কথাই উঠে না। ইহার একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, তাহা হইলে, অমিত্রাক্ষরের ৮+৬, শেষের ৬ মাত্রা পূরণ না করিয়াই, এমন ডিঙাইয়া পরের চরণে পৌঁছিতে পারিত না। এই খণ্ডপর্ব্বও গীতিচ্ছন্দের একটি বৈশিষ্ট্য—ইহার বৈচিত্র্য ও বৈভবের একটা বড় সহায়। এই খণ্ডপর্ব্ব সম্বন্ধে দুইটি নিয়ম লক্ষ্য করিবার মত। প্রথমত, মূল পর্ব্বের খণ্ড বলিয়া ইহা আয়তনে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র; দ্বিতীয়ত, যুক্ত ও মিশ্র পর্ব্বের খণ্ডপর্ব্ব, গঠনে ও আয়তনে, সেই যুক্ত ও মিশ্র পর্ব্বের নানাবিধ ভাগের বশ্যতা স্বীকার করে। ছন্দের পর্ব্ব যদি অসম ও মিশ্র হয়, তাহা হইলে তাহাতে আর খণ্ডপর্ব্ব থাকে না, সেই খণ্ডপর্ব্বই একটি অসম পূর্ণপর্ব্ব হিসাবে গণ্য হইতে পারে। আমি এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা না করিয়া কতকগুলি পদ্যপংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে নানা আকারের নানাবিধ খণ্ডপর্ব্ব এবং ছন্দের উপরে তাহাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যাইবে।

[প্রত্যেকের বামে যে দুইটি করিয়া সংখ্যা-চিহ্ন আছে, তাহার প্রথমটি মূল পর্ব্বের, ও দ্বিতীয়টি খণ্ডপর্ব্বের মাত্রা-সংখ্যা]

দ্বৈমাত্রিক

(৪/১)—খিল্‌খোলা • ফর্দ্দাতে • যাব চল্ • সাধ জেগে • **ছে** (সত্যেন্দ্রনাথ)
(৪/২)—দেবতার • অবতার • বসুধার • **তলে** ('ছন্দ'—রবীন্দ্রনাথ)
(৪/৩)—দিন শেষ • হয়ে এল • আঁধারিল • **ধরণী** (রবীন্দ্রনাথ)

ত্রৈমাত্রিক

(৬/১)—কুঞ্জে আমার • এসে ফিরে গেছে • অকাল বৈশা-খী ('ঘাসের ফুল')
(৬/২)—আমি, কুসুম শয়নে • মিলাই সরমে • মধুর মিলন • **রাতি** (রবীন্দ্রনাথ)
(৬/৩)—নূপুরের মত • বেজেছি চরণে • **চরণে** (রবীন্দ্রনাথ)
(৬/৪)—জলে ডুব দেওয়া • নূতন তোর কি • **দহচারী** (কালিদাস)
(৬/৫)—এমন করিয়া • কেমনে কাটিবে • **মাধবী রাতি** (রবীন্দ্রনাথ)

[চার ও পাঁচ মাত্রার খণ্ডপর্ব্বে যথাক্রমে ৩+১ এবং ৩+২ এইরূপ ভাগ আছে—ত্রৈমাত্রিক যুক্তপর্ব্বের চরণেও খণ্ডপর্ব্ব যদি তিন মাত্রার বেশি হয়, তাহাতেও এইরূপ ভাগ (৩+১) থাকাই স্বাভাবিক। সেখানে চার মাত্রার খণ্ডপর্ব্ব যদি এইরূপ (৩+১) না হইয়া (২+২), অর্থাৎ গোটা চার মাত্রার হয়, তাহা হইলে উহাকে খণ্ডপর্ব্ব না বলিয়া একটি ভিন্ন জাতীয় পর্ব্ব বলাই সঙ্গত, যেমন—

বহুদিন হ'ল • কোন্ ফাল্গুনে • ছিনু আমি তব • ভর-সায়

এখানে 'ভরসায়' একটি দ্বৈমাত্রিক পর্ব্ব এই ত্রৈমাত্রিক চরণের শেষে যুক্ত হওয়ায় ছন্দে একটি বিশেষ দোলা লাগিয়াছে। ইহার সহিত—

৬/৪ (৩+১)—লস্কর মোরা • সূর্য্যদেবের • স্বাস্থ্য মোদের • সঙ্গ-তি (সত্যেন্দ্রনাথ)

কিম্বা, ঠিক ঐরূপ—

আঁধার ধাঁধার • জবাব মেলে না • জানো না কি ('স্বপন-পসারী')

তুলনা করিলেই দেখা যাইবে, এই দুই জাতীয় খণ্ডপর্ব্বের মাত্রা-পরিমাণ এক হইলেও, একটি দ্বৈমাত্রিক ও অপর দুইটি ত্রৈমাত্রিক বলিয়া ছন্দধ্বনির পার্থক্য আছে।]

মিশ্রপর্ব্ব—সম

৫ (৩+২) / ১—ঘুমাতে তুমি • গভীর আল • **সে** (রবীন্দ্রনাথ)
৫ (৩+২) / ২—সাগর জলে • সিনান করি • সজল এলো • **চুলে** (ঐ)
৫ (৩+২) / ৩—শ্যামল তৃণ • শয়নতলে • ছড়ায়ে মধু • **মাধুরী** (ঐ)

৫ (৩+২) / ৪ (৩+১)—মথ্‌মলেরি • বিছ্‌না পরে • ঘুমায় কোলে • **সারঙ্‌-গী** ('স্বপন-পসারী')
৫ (৩+২) / ৪ (২+২)—প্রকৃতিবধূ • চাহিবে মধু • পরিবে নব • **আভরণ** (রবীন্দ্রনাথ)
৭ (৩+৪) / ১—খাঁচার+পাখী বলে • শিখানো+গান গাহ • বনের •+পাখী বলে • **না**
৭ (৩+৪) / ২—
খাঁচার+পাখী ছিল • সোনার+খাঁচাটিতে • বনের+পাখী ছিল • **বনে** (রবীন্দ্রনাথ)
৭ (৩+৪) / ৩—
মুখে সে+চাহে যত • নয়ন+করি নত • গোপনে+মরে কত • **বাসনা** ('ছন্দ'—রবীন্দ্রনাথ)
৭ (৩+৪) / (৩+১)
নিশীথে+মুখ তার • হেরিব+ঘুম ঘোরে • দিবসে+স্মরি তাহা • **কাঁদিব-রে**
৭ (৩+৪)/৪ (২+২)
কবরী+ঘেরি রহে • নবীন+ফুলমালা • কাজলে+আরো কালো • **দুনয়ন**
৭ (৩+৪)/৫ (৩+২)
ছিলাম+আনমনে • একেলা+গৃহকোণে • কে যেন+ডাকিল রে • **জল্‌কে চল** (রবীন্দ্রনাথ)

[৩+৪ মিশ্রপর্ব্বের খণ্ডপর্ব্ব ছয়মাত্রার হয় না, কারণ, ছয়মাত্রার ভাগ—৩+৩, ২+৪, ৪+২ হইবে, এবং তাহাতে খাঁটি ত্রৈমাত্রিক ছন্দের একটি পর্ব্ব গড়িয়া উঠিবে—তাহা মিশ্রও হইবে না, খণ্ডও হইবে না।]

মিশ্রপর্ব্ব—অসম

ইহাতে খণ্ডপর্ব্ব একটি পূর্ণপর্ব্বের সামিল—অতএব খণ্ডপর্ব্ব নাই, যথা—

কণ্ঠে খেলিতেছে • সাতটি সুর • সাতটি যেন • পোষাপাখী

—ইহার শেষ পর্ব্বটিও একটি পূর্ণ অসম পর্ব্ব, খণ্ডপর্ব্ব নহে।

এই খণ্ডপর্ব্বগুলির সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিবার আছে। ত্রৈমাত্রিক ছন্দে ছয়-মাত্রার পর্ব্বকে পূর্ণপর্ব্ব ধরিলে, ছন্দের শেষে একটি

খণ্ডপর্ব্ব না থাকিলে, ছন্দপ্রবাহ সমাপ্ত হয় না ; কিন্তু দ্বৈমাত্রিক ছন্দে খণ্ডপর্ব্ব না থাকিলেও ছন্দ-পূরণ হইতে পারে, যথা—

মেঘ ডাকে • গম্ভীর • গরজনে।
ছায়া নামে • তমালের • বনে বনে।

মিশ্রপর্ব্বের চরণেও খণ্ডপর্ব্ব অত্যাবশ্যক নয়।

এইখানেই আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ অতি সংক্ষেপে করিব। চরণের শেষে খণ্ডপর্ব্বের মত—চরণের পূর্ব্বে, ছন্দের অতিরিক্ত (Hypermetric) যে অক্ষর থাকে, তাহার দ্বারাও এক প্রকার ছন্দ-হিল্লোলের সৃষ্টি হয়। সাধারণত ইহার ফলে চরণের আদ্য পর্ব্বে যে একটি প্রবলতর ঝোঁক পড়ে, সেই ঝোঁক পরের পর্ব্বগুলিতেও বজায় থাকে। যথা—

যারা নিত্য কেবল • ধেনু চরায় / বংশীবটের • তলে
যারা গুঞ্জাফলের • মালা গেঁথে / পরে, পরায় • গলে।

নিম্নোদ্ধৃত পদ্যাংশটিতে এই কৌশলে ছন্দে এমন দোলা লাগিয়াছে যে মূল ছন্দটি কাণে যেন অন্যরূপ হইয়া দাঁড়ায়—

দূর / বাবলাগাছের ফাঁকে • বাঁকা চাঁদটাই
মিছা / জাগায় স্বপন।
হোথা / আকাশ ঝুলিয়া যেন / পড়েছে মেঘে,
ক্ষ্যাপা / আশ্বিনে ঝড় আসে / ঝড়ের বেগে,
ট্রেন / ছুটবে আঁধারে, আমি / শুনব জেগে
খালি / তারি ঝন ঝন,
পোড়া / চুরুট হইতে জানি / ঝরবেই ছাই,
ছাই / উড়বে তখন। —('কেড্‌স ও স্যাণ্ডাল')

পর্ব্ব ও খণ্ডপর্ব্ব সম্বন্ধে ইহার অধিক আলোচনার অবকাশ নাই। এইবার আমি পদ ও পর্ব্বের প্রভেদ আর একটু বিস্তারিতভাবে নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ

আড্ডার একপাশে খুদুদা মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়াছিলেন। খুদুদার মুখ অধিকাংশ সময়েই গম্ভীর থাকে না, তাই একটু আশ্চর্য্য ঠেকিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি খুদা? ওরকম গরুগম্ভীর মুখ?

খুদা কথা কহিলেন না। আবার বলিলাম, কি হয়েছে বলুন না ছাই, শরীর খারাপ?

খুদা এইবার ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন, শরীর খারাপ হওয়া কি এমনই একটা ভয়ানক ব্যাপার যার জন্যে মন খারাপ হবে?

অবাক হইলাম। শরীরটা সম্বন্ধে আমার নিজের, এবং সচরাচর সকলেরই একটা অহেতুক দুর্ব্বলতা আছে। শরীর খারাপ হইলেই মন খারাপ হয়, ইহাই তো জানি। খুদুদাকে এই নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়া কোন দিন ভাবি নাই।

খুদুদা বলিলেন, পৃথিবী জুড়ে কি ব্যাপার হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না? সভ্যতার যুগ শেষ হয়ে আমরা যে আবার বর্বর যুগে চলেছি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে?

স্বীকার করিলাম যে সন্দেহ নাই।

তবে? ভাবতে পার, পৃথিবীর যুগযুগের সভ্যতা, গ্রীক, রোম্যান, অ্যাংলো-স্যাক্সন, নর্ডিক—সব কি অবস্থায় পড়েছে? গ্রীসের প্রাচীন কীর্ত্তি, রোমের ভাস্কর্য্য স্থাপত্য লণ্ডনের হাইড-পার্ক-কর্নার, পিকাডিলি সার্কাস, বার্লিনের—উঃ—!

ঘটনাটা নিঃসন্দেহে শোকাবহ। আমরাও যে কথাগুলি না ভাবিয়াছি তাহা নহে। ভাবিয়া লজ্জিত হইলাম, সারা জগৎ জুড়িয়া যখন সভ্যতা

ও সংস্কৃতির উপর এই মারণযজ্ঞ চলিয়াছে, তখন আমরা কলিকাতার এই এঁদোগলির একতলার ঘরে মলিন ফরাশে বসিয়া, টু ক্লাব্‌স, থ্রি নোট্রাম্প্‌স হাঁকিতেছি।

সেদিন খেলা জমিল না।

কয়েকদিন পরের কথা। সেই এঁদোগলি, সেই আড্ডা, সেই ব্রিজ এবং সেই একই বন্ধুবর্গ, ভূতো, জগদীশ, রজনী, গদাই ইত্যাদি। শুধু খুদুদা অনুপস্থিত।

নিবিষ্টমনে স্টেট্‌সম্যান খুলিয়া ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল্ করিতেছি। বাকি সকলে তাস খেলিতেছে অথবা খেলা দেখিতেছে। সহসা খুদুদার প্রবেশ। মুখ গম্ভীরতর।

আজ আর কিছু প্রশ্ন করিতে সাহস পাইলাম না। চোরের মত চুপিচুপি কাগজখানি তাকিয়া চাপা দিয়া শোকের প্রতিমূর্ত্তি হইয়া বসিয়া রহিলাম।

হঠাৎ ভূতো বোকার মত প্রশ্ন করিল, কি খুদ্দা, শরীর খারাপ নাকি?

খুদুদা বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া বলিলেন, তোমাদের বিশ্বাস, সমস্ত জগৎটা তোমাদের নিজেদের সুখদুঃখের মধ্যে সীমাবদ্ধ, (খুদুদা সময়ে সময়ে বড় বেশি সাধুভাষায় কথা বলেন) নয়? একটা লোকের সুখদুঃখ নিয়ে জগৎ তৈরি নয়, বুঝলে? তোমার মাথাধরা, রজনীর পেটকামড়ানো, গদাইয়ের বউয়ের হিষ্টিরিয়া, এর বাইরেও আর একটা বড় পৃথিবী আছে।

সকলেই স্বীকার করিলাম, আছেই তো।

ভেবে দেখ তো ঢাকার ব্যাপারটা। বলা নেই কওয়া নেই, কিছুর মধ্যে কিছু নয়—দাঙ্গা, খুনোখুনি, লুটপাট—উঃ, ভাবা যায় না!

আমরা সে কথা জানিতাম বলিয়া ভাবিবার চেষ্টাও করিলাম না।

খুদুদা বলিলেন, নিজেদের কথা ভাবা দিনকতকের জন্যে পোস্টপোন রেখে বৃহত্তর বাঙালী-জাতির কথা ভাব। এমন ক'রে কদ্দিন চলবে?

জানিতাম না, কাজেই কেহ কথা কহিলাম না।

সহসা খুদুদা বলিলেন, দেখ, বাজে কথা রেখে একটা কাজ করতে পার?

সচকিত হইয়া বলিলাম, কি?

কলকাতায় এক একটা বিয়ের সিজ্‌নে কতগুলো ক'রে বিয়ে হয়?

সহসা এ প্রশ্নের অর্থ বুঝিলাম না। তবু জবাব দিলাম।

আমি বলিলাম, পঁচিশ; ভূতো, জগদীশ, রজনী, গদাই, ভবশঙ্কর, সুধ্যি, ও ভজা যথাক্রমে—দুহাজার, শখানেক, ছশো, পঞ্চাশ, গোটাকুড়ি, আটশো ও পাঁচহাজার।

খুদুদা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তোমরা বড় বাজে বক, দুনিয়ার কোন খবর রাখ না। ধ'রে নাও, এক সিজ্‌নে বিয়ে হয় তিনশো। সেই তিনশো বিয়েতে তোমাদের মত গোটাকয়েক অপদার্থকে পোলাও কালিয়া খাওয়াতে কত খরচ হয় জান? per বিয়ে কম ক'রে ধ'রে ছশো টাকা। তা হলে তিনশো বিয়েতে? বরের বাড়ি আর কনের বাড়ি ধ'রে ছশো ইন্টু ছশো, প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকা!

ইস!

খুদুদা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তুমি আনন্দবাজারে একখানা চিঠি লেখ—লেখ যে, বিয়েতে এই সব বাজে খরচ না ক'রে সব টাকা যেন ঢাকার দাঙ্গার sufferer-দের দেওয়া হয়। পারবে?

আমি না হয় পারলাম, তারা শুনবে কেন?

আলবৎ শুনবে, তাদের বিবেককে জাগ্রত করবার ভার আমি তোমার ওপর দিলাম।

এতবড় একটা গুরুভার ঘাড়ে পড়ার ফলে গৌরবান্বিত হইলাম, কিন্তু অস্বস্তি বোধ করিলাম তাহার চেয়ে অনেক বেশি। অতি শীঘ্রই দুই জ্যেঠতুত বোনের বিবাহ, সেক্ষেত্রে—তাহা ছাড়া—

কিছু বলিতে গিয়া দেখি, খুদুদা চলিয়া গিয়াছেন। সেদিনও আড্ডা জমিল না।

আরও কয়েক দিন পরে। ভূমিকালিপি, রঙ্গমঞ্চ, ও নাটক পূর্ব্ববৎ।

খুদুদার মুখ গম্ভীর। পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক, অনেক বেশি।

সহানুভূতির স্বরে বলিলাম, খুদুদা, ইউরোপের—

ভূতো বলিল, খুদ্দা, ঢাকা থেকে আমার এক পিসতুতো ভায়রা এসেছে, বলছিল—

খুদুদার নিকট হইতে কোনও উৎসাহবাণী পাইলাম না। আমি একপয়সা দামের বৈকালিক কাগজে টাটকা খবর পাইয়াছিলাম, সহজে হাল ছাড়িলাম না। আবার ডাকিলাম, খুদুদা, খুদ্দা, ইউরোপের—

খুদুদা বলিলেন, দুত্তোর ইউরোপ!

ভূতো বলিল, ঢাকায় আমার এক পিসতুতো ভায়রা থাকে, কাল এসেছে—

খুদুদা বলিলেন, চুলোয় যাক ঢাকা আর জাহান্নামে যাক তোমার পিসতুতো ভায়রা।

বৃহত্তর মানব-জাতিক পরিস্থিতির নিকট ইউরোপের মহাযুদ্ধ ও ঢাকার মহাদাঙ্গা নগণ্যতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

বৃহত্তর 'পরিস্থিতি'টা কি, জিজ্ঞাসা করিতেছেন?

বিশেষ কিছু নয়, খুদুদার দন্তশূল হইয়াছে।

এবারেও আড্ডা জমিল না।

আকুসে

রাত্রি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১

কার্য্যকারণের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। এর পরে যা ঘটেছিল তারও একাধিক কারণ ছিল, যদিও সে কারণগুলো তখন আমার মনে তত স্পষ্ট ছিল না, এখন যতটা হয়েছে। সমস্ত জিনিসটা পর্য্যালোচনা ক'রে এখন আমি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছি (যদিও সেটা মাসীর গোঁফ গজালে মামা হ'ত গোছ হাস্যকর সিদ্ধান্ত)—। এই কথাটাই এখন আমার মনে হয় যে, অবনীশের ব্যবসায় এবং সামাজিক বুদ্ধি যদি আর একটু কম প্রকট হ'ত, সেদিন গভীর নিশীথে নিখিল চৌধুরীর ছাতে প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়িয়ে রাত্রির কান্না যদি না দেখতাম এবং মোহের প্ররোচনায় প'ড়ে নিজেকে কুসংস্কারহীন অতি-আধুনিক আত্মত্যাগী ব'লে, শুধু প্রচার নয়, প্রমাণ করবার উৎকট আকাঙ্ক্ষা যদি আমাকে না পেয়ে বসত, তা হ'লে হয়তো এমন হ'ত না। শেষোক্ত কারণটাকেই মুখ্য বলতে আমি রাজি নই, যদিও ধরণীবাবু এবং নিখিল চৌধুরীর তাই মত—কারণ আগের দুটোর অস্তিত্ব না থাকলে আমার মোহ নিজেকে জাহির করবার সুযোগ এবং সম্ভবত প্রেরণাও পেত না। গাছের উদ্ভবের জন্য মাটি এবং বীজ উভয়েরই সমান প্রয়োজন।

অবনীশের কথা চিন্তা করলেই আমার খুব ছেলেবেলায় দেখা এক স্টেশন-মাস্টারের কথা মনে পড়ে। স্টেশনের নাম মনে নেই, কোন্ রেলওয়ে তাও মনে নেই, তবে ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে। স্টেশনটা খুব ছোট, এক মিনিটের বেশি কোন গাড়িই সেখানে বোধ হয় থামে না। স্টেশনেরই এক অংশে স্টেশন-মাস্টারের কোয়ার্টার। চারিদিকে ধু ধু করছে মাঠ। আমাদের ট্রেন যখন সেখানে পৌছল, তখন সন্ধ্যা আসন্ন।

অস্তগামী সূর্য্যের লাল আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। স্টেশনের পাশেই একটি নধরকান্তি গাই বাঁধা রয়েছে, আর নিকটেই একটি বলিষ্ঠ-গঠন প্রৌঢ় ব্যক্তি হেঁট মুখে খালি গায়ে উর্দ্ধশ্বাসে জাব মেখে চলেছেন। দু হাতের কনুই পর্য্যন্ত খোল খড় মাখা। ট্রেন এসে দাঁড়াতেই তিনি জাবের ডাবা থেকে মুখ তুলে ডাকলেন, কই রে ফাগুয়া! ফাগুয়া স্টেশনের ভেতর থেকে একটা টুপি নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল এবং সেটা তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলে। টুপিতে লেখা রয়েছে—এস. এম.। তিনি খোল-খড়-মাখা ডান হাতটা তুলে বললেন, অল রাইট, অল রাইট। ফাগুয়া ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজালে, লাইন ক্লিয়ার দিলে, গার্ড সাহেব হুইস্‌ল দিলেন, ট্রেন চলতে লাগল। অবনীশের সঙ্গে এই স্টেশন-মাস্টারের বাহ্যিক কোন সাদৃশ্য নেই, কিন্তু মূলত মিল আছে। দুজনেই বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ঘোর স্বার্থপর, দুজনেই শ্যাম এবং কুল দুইই বজায় রাখতে অশোভনভাবে ব্যস্ত। অবনীশের চেহারাটা দেখে হঠাৎ তাকে খুব খারাপ লোক ব'লে মনে হয় না। খুব বেঁটে, সায়েবি-পোশাক-পরা, শ্যামবর্ণ লোকটি—পুরু ঠোঁট, ভুঁড়ো নাক; কিন্তু সমস্ত মুখখানাতে এমন একটা সদা-সপ্রতিভ ভাব আছে যে, তাতেই মুখখানা কিঞ্চিৎ শ্রীসম্পন্ন হয়েছে। দেখলেই, অর্থাৎ পরিচয় পাওয়ার আগে মনে হয়, লোকটি নির্ভরযোগ্য, ভেতরে শক্তি আছে। পরিচয় পেলে মনে হয়, শক্তি আছে বটে, কিন্তু সে শক্তির এক বিন্দু তিনি অপচয় অর্থাৎ অপরের জন্যে ব্যয় করতে রাজি নন। মাথায় হ্যাট আছে, ছোট একটি টিকিও আছে'। দুটোই তিনি শিরোধার্য্য করেছেন, আমার মনে হয়, ব্যবসার খাতিরে; নিরামিষ আহার করাটাও বোধ হয় ব্যবসার অঙ্গ। এদেশে বিশুদ্ধ ঘিয়ের ব্যবসা করতে হ'লে এসব চাই।

চামেলির মুখে যখন খবর পেলাম যে, রাত্রিকে নিয়ে অবনীশবাবু এসে পৌঁছেছেন, তখন আমার মনে আশার চেয়ে আশঙ্কাই বেশি প্রবল হয়ে উঠেছিল। অনেক দিন আগে শোনা স্বর্ণেন্দুর কথাগুলা মনে হয়েছিল—সে কখনও মুখ ফুটে কিছু বলবে না ব'লে, সব জেনেশুনেও তাকে এমন একটা লোকের হাতে দিতে হবে, যাকে সে মোটে পছন্দ করে না? ভয় হয়েছিল, প্রবলপরাক্রান্ত অবনীশের কবল থেকে রাত্রিকে উদ্ধার

করবার মত সামর্থ্য হয়তো আমার নেই। রাত্রির ওপর আমার কি জোর আছে, কোন্ অধিকারে আমি এর বিরুদ্ধাচরণ করব?

নিখিলবাবুর বাসায় এসেই অবনীশের সঙ্গে দেখা হ'ল। নীচের বসবার ঘরে একাই ব'সে ছিলেন তিনি, হাতে একটা পেন্সিল ছিল। আমাকে দেখেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং সপ্রতিভভাবে বললেন, আসুন, আপনিই আশা করি ডক্টর সরকার, আমি অবনীশ।

নমস্কারান্তে বসলাম।

আমাকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই আবার বললেন, আচ্ছা, বাই এনি চান্স, আপনি বড়বাজারের ঘিয়ের আড়তদার কাউকে চেনেন?

না।

কোনও ব্রোকার?

না।

ঠোঁট দুটো ফাঁক ক'রে পেন্সিল দিয়ে সামনের একটা দাঁতে আস্তে আস্তে টোকা দিতে লাগলেন চিন্তিত মুখে। তারপর হঠাৎ টেলিফোন-গাইডটা খুলে একটা নম্বর খুঁজে বার ক'রে ফোন করলেন কাকে, ফোনে ঘি সম্বন্ধে আলোচনা চলতে লাগল হিন্দীতে।

এতদিন অবনীশ আর রাত্রিকে কেন্দ্র ক'রে পূর্ব্বরাগরঞ্জিত যে কুয়াশাটা আমার মনে সঞ্চিত হয়েছিল, একটা আচমকা দমকা হাওয়ায় সেটা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ফুটকি দিয়ে আঁকা এক রকম ছবি আছে, দু দিক থেকে দু রকম দেখায়। একই ছবি এক দিক থেকে দেখলে হয়তো রমণীর মুখ, উল্টো দিক থেকে দেখলে ওরাংওটাং। ছবিটাকে উল্টো দিক থেকে দেখতে পেয়ে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম আমি।

হাঁ হাঁ, আভি, তুরন্ত্।

রিসিভারটা নামিয়ে অবনীশ উঠে দাঁড়ালেন। মাথার সামনের কেশবিরল অংশটায় হাত বুলিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন, চলুন ডক্টর সরকার, ট্যাক্সিতেই আপনার সঙ্গে আলাপ হবে। দুটো কথা

আছে আপনার সঙ্গে। নিখিলবাবু যখন নেই, তখন আপনাকেই ব'লে যাই, নেক্স্ট বেস্ট ম্যান।

কোথা যাবেন আপনি?

বেশি দূর নয়, বড়বাজার। তারপর একটা হোটেল ঠিক করতে হবে আমাকে আজ রাত্রের মতন। কালই আমি ফিরে যাব, হয়তো আর দেখাই হবে না আপনার সঙ্গে।

দু হাত দিয়ে টেনে তিনি প্যাণ্টালুনটা ঠিক ক'রে নিলেন।

হোটেল কেন?

একটু হেসে অবনীশ বললেন, আমি থাকব।

রাত্রি আসে নি? সে কোথায়?

সে ওপরে আছে, সে এখানেই থাকবে। চলুন।

রাস্তায় বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে দুজনে চ'ড়ে বসলাম। ট্যাক্সিতে চ'ড়ে অবনীশ কণ্ঠে অন্তরঙ্গতার সুর ফুটিয়ে বললেন, দেখুন, আপনার কথা শুনেছি আমি অনেক, আপনার লেখাও পড়েছি, সেইজন্যেই ভরসা করছি, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

আমি একটু বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলাম।

অবনীশ আবার বললেন, এ বাড়িতে আমি রাত কাটাতে চাই না। গাড়িতেও আমরা একসঙ্গে আসি নি, দুটো আলাদা আলাদা কম্পার্টমেণ্টে ছিলাম।

এতে আমার বিস্ময় বাড়ল দেখে তিনি একটু হেসে বললেন, আলাদা আলাদা যে ছিলাম, তার ডকুমেণ্টারি প্রমাণ রাখবার জন্যে পয়সা খরচ ক'রে ভিন্ন দুটো কম্পার্টমেণ্ট বার্থ রিজার্ভ করিয়ে এসেছি। এখানেও হোটেলে থাকতে চাই, ডকুমেণ্টারি এভিডেন্স একটা থাকবে।

ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না।

বললাম, এর মানে কি?

মানে কি, আপনারা ডাক্তার মানুষ দুদিনেই বুঝতে পারবেন। স্বর্ণেন্দুর বন্ধু হিসেবে যেটুকু কর্ত্তব্য ছিল করলাম, তাকে তার আত্মীয়ের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেলাম। পূর্ণেন্দুবাবুর বর্ত্তমান ঠিকানাটা খুঁজে

সেইখানেই পৌঁছে দেবেন আপনারা, যদি দরকার মনে করেন। আমি হাত ধুয়ে ফিরে যেতে চাই।

জ্যোতির্ম্ময়বাবু কোথায়?

একটা অদ্ভুত রকম হাসি হাসলেন অবনীশ।

আহ্ আহ্ আহ্ আহ্—ঈষৎ মুখ ফাঁক ক'রে খুব আস্তে আস্তে এই শব্দটা করলেন। তারপর বললেন, আপনি জ্যোতির্ম্ময়বাবুর কথা জানেন তা হ'লে?

শুনেছি কিছু।

আরও শুনবেন ক্রমশ।

তাঁর কণ্ঠস্বর কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠল। ভুঁড়ো নাকের নীচে পুরু ঠোঁট দুটো কি যেন বলি বলি ক'রে চেপে গেল।

জ্যোতির্ম্ময়বাবু কোথায় এখন?

প্যারিসে। কিছু টাকা যোগাড় ক'রে তিনি প্যারিসে চ'লে গেছেন আর্ট চর্চ্চা করবার জন্যে—আর্টিস্ট লোক।

চুপ ক'রে ব'সে রইলাম আমি।

অবনীশ বড়বাজারে ট্যাক্সি থামিয়ে নানা দোকানে ঘুরলেন। একটা গলির ভেতর ঢুকে গেলেন শেষে। আমি ট্যাক্সিতেই চুপ ক'রে ব'সে রইলাম। স্টেশন-মাস্টারের ছবিটা ফুটে উঠল মনে। মনে হ'ল, চাকরির সময় ঊর্দ্ধশ্বাসে গরুর জাব দেওয়ার মধ্যে খাঁটিদুগ্ধলোলুপ যে মনের পরিচয় সেদিন পেয়েছিলাম, আমাদের অধিকাংশের মনোবৃত্তি হয়তো ওই। জীবনের আনন্দ গৃহস্থালিতে, চাকরিতে নয়, চাকরিটা বজায় রাখতে চাই গৃহস্থালির সুবিধে হবে ব'লে। গৃহস্থালির সঙ্গে চাকরির বিরোধ যদি কোন দিন দুরতিক্রম্য হয়ে ওঠে, তখন স্টেশন-মাস্টারকে চাকরিটাই ছাড়তে হবে, গৃহস্থালিটা নয়। সব রকম বাঁচিয়ে যদি প্রেম করা চলত, অবনীশ রাজি ছিলেন। কিন্তু নিজের সুনাম ক্ষত-বিক্ষত ক'রে? এই রকম মেয়ের সঙ্গে? অবনীশ মোটেই তাতে রাজি নন। প্রয়োজন হ'লে শুধু টিকি আর নিরামিষ আহারের নজিরেই নয়, দলিলের জোরে তিনি প্রমাণ করবেন যে, রাত্রির সঙ্গে কলঙ্কজনক কোন ঘনিষ্ঠতা তাঁর হয় নি। তিনি নিজের ব্যবসার খাতিরে কলকাতা

এসেছিলেন, বন্ধুর বোন হিসাবে ভিন্ন কম্পার্টমেণ্টে ভিন্ন বার্থে অধিষ্ঠিতা রাত্রির একটু আধটু খোঁজখবর মাত্র করছিলেন তিনি, আর কিছু নয়।

খানিকক্ষণ পরে অবনীশ ফিরে এলেন।

ফিরে এসে বললেন, যাক, হাজার টাকার বিজ্‌নেস হ'ল। ট্রিপটা নেহাৎ বৃথায় গেল না।

আমি ভদ্রতার খাতিরে সায় দিয়ে মুচকি হাসলাম।

অবনীশ নামজাদা একটা হোটেলে গিয়ে উঠলেন এবং ট্যাক্সি-ওয়ালাটাকে ব'লে দিলেন, আমাকে যেন বেনেটোলায় পৌঁছে দেয় সে, তার জন্যে ভাড়াটাও দিলেন তাকে অগ্রিম।

গুড নাইট।

গুড নাইট।

জনতা ভেদ ক'রে ট্যাক্সি ছুটতে লাগল।

আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলাম।

২

"আপনারা কি আশা করেন, বংশীর সেই কুৎসিত প্রলাপ জ্যোতির্ম্ময় এসে শুনবে—এ সম্ভাবনা জেনেও আমি চুপ ক'রে ব'সে থাকব? আমি? কিন্তু স্টেশনে গিয়ে দেখলাম, জ্যোতির্ম্ময়ের আসা চলবে না, সবিতার স্বপ্নে তার দুটি চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। দেখলাম, আমার দিকে চেয়ে সে ভাবছে সবিতাকে। এ দেখবার পরও কি আমি তাকে সবিতার বাড়ি যেতে দেবার সুযোগ দিতে পারি? তা ছাড়া সে এসেই হয়তো পুলিসের হাতে পড়ত। সবিতা, পুলিশ—কিছুতেই তাকে আসতে দিলাম না। কেমন ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে গেলাম? আলেয়া যেমন ক'রে পথিকের পথ ভোলায়, বাঘিনী যেমন ক'রে অসহায় হরিণের ঘাড় মটকে তাকে অনায়াসে পিঠে ক'রে তুলে নিয়ে যায়, তেমনই ক'রে। কিন্তু তবু সে রইল না। যে হরিণটাকে মরা ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলাম, হঠাৎ সেটা আমার অন্যমনস্কতার সুযোগে তড়াক ক'রে উঠে

গহন বনে অদৃশ্য হয়ে গেল চকিতের মধ্যে।" না, রাত্রি এসব কথা বলে নি। আমি কল্পনা করেছিলাম, যেন রাত্রি বলছে। রাত্রিকে আমি এসব বিষয়ে প্রশ্নই করি নি কোন দিন। অবকাশ হয় নি ব'লে নয়, সাহস হয় নি, ভদ্রতায় বেধেছিল। তা ছাড়া, লোকে প্রশ্ন করে সংশয় নিরশনের জন্যে, আমার মনে কোন সংশয় ছিল না। আর এক দল অভদ্র লোক সব জেনেশুনেও প্রশ্ন করে অপ্রস্তুত করবার জন্যে। এসব প্রশ্ন ক'রে রাত্রিকে আমি অপ্রস্তুত করতে পারতাম কি না, জানি না; কিন্তু তাকে অপ্রস্তুত করবার বাসনাই আমার মনে হয় নি কোন দিন।

আমি কল্পনা করেছিলাম। সেদিন রাত্রে নিখিল চৌধুরীর ছাতে প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়িয়ে পাশের ঘরের বিছানায় রোরুদ্যমানা রাত্রিকে দেখে অনেক রকম কল্পনা করেছিলাম আমি। মেঘভারাক্রান্ত নিবিড় রাত্রি অন্ধকারে লুকিয়ে কাঁদছিল। আমি সে কান্না দেখেছিলাম, শুনেছিলাম, কেমন যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম নিজেকে। জলে বরফ যেমন গ'লে যায়, তেমনই আমার মনের জমাট সংস্কারগুলো ধীরে ধীরে গ'লে যাচ্ছিল। শ্রাবণ-শর্ব্বরীর নিরবচ্ছিন্ন ধারা-বর্ষণ অন্তরলোকে যে নিবিড় রহস্যলোক সৃজন করে, সে রহস্যলোকের নিগূঢ় অস্পষ্টতায় যেমন বুদ্ধিবৃত্তির কোন যুক্তি চলে না, একটা সশঙ্ক উৎকর্ণ অনুভূতি অবুঝের মত রুদ্ধশ্বাসে অনির্দ্দিষ্ট একটা কিছুর প্রত্যাশা করে যেমন প্রতি মুহূর্ত্তে, তেমনই আমার মনে হচ্ছিল, হয়তো অসম্ভব সম্ভবপর হয়ে উঠবে, হয়তো রাত্রি এখনই উঠে ব'সে চীৎকার ক'রে বলবে, আমি তোমাদের আইন মানি না, ধর্ম্ম মানি না, কিছু মানি না, আমি কেবল আমাকেই মানি। আমি আছি ব'লেই তোমরা আছ, জগৎ-সংসার আছে,—আমার আমিত্বটাকে চেপে পিষে দ'লে মেরে ফেলতে দোব না, দোব না, দোব না। পারবে না তোমরা, কিছুতেই আমাকে এঁটে উঠতে পারবে না, তোমাদের সমস্ত আইন ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়ে আমি নিজকে জাহির করবই।

কিন্তু কিছুই সে বলে নি। আলুলায়িত কুন্তলে বিছানার উপর উপুড় হয়ে প'ড়ে অঝোরঝরে কাঁদছিল সে। আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। আমি যে দেখছিলাম, তা সে জানত না। তার দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তাকে যে একদিন দেখেছিলাম, সে কথা কোন দিন তাকে বলি

নি। তার ধারণা, সম্রাজ্ঞীর মত অনুকম্পাভরেই সে আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। আমি যেন আমার নিজের গরজেই তার কাছে কৃপা-ভিক্ষা করেছিলাম, এবং উদারতা-চর্চ্চা করবার সুযোগটা দিয়ে সে যেন আমাকে কৃতার্থ করেছিল। তার ভূলুণ্ঠিত সত্তার আকুল ক্রন্দন যে আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম, সে কথা তাকে জানিয়ে কি লাভ হ'ত আমার? তাকে শুধু ছোট করা হ'ত, সঙ্কুচিত করা হ'ত, তার পরাজিত বিধ্বস্ত অহমিকাকে নীচের মত উপহাস করা হ'ত। রাত্রিকে অপমান করবার মত কাপুরুষতা অথবা নিষ্ঠুরতা আমার ছিল না। জ্যোতির্ম্ময়ের কথা আলাদা। সে বিশুদ্ধ শিল্পী, তাই সে স্বভাবতই নিষ্ঠুর। শিল্পীরা আলোকতীর্থের যাত্রী। যুগে যুগে তিমিরময়ী রাত্রিকে অতিক্রম ক'রে চ'লে যায় তারা। জ্যোতির্ম্ময়কে দোষ দিই না আমি।

অবনীশের সঙ্গে রাত্রি কলকাতায় এসেছিল কেন, এ প্রশ্ন আমার মনে জেগেছিল। তখন তার কোন উত্তর পাই নি, পরে পেয়েছিলাম। রাত্রি এসেছিল দেখতে, সবিতা কলকাতায় আছে কি না। সবিতা ছিল।

নবম পরিচ্ছেদ

কলকাতা শহরের ট্রাম ট্যাক্সি জনতা কোলাহল, ধরণীবাবুর ছদ্ম উৎকণ্ঠা, নিখিল চৌধুরীর নির্জ্জলা ক্রোধ, রাখালবাবুর উইল, ডি. কে.র বর্ণনা, ডাক্তারী জীবনের সফলতা-নিষ্ফলতা, লেখক-জীবনের প্রেরণা-অবসাদ—এ সমস্ত সত্ত্বেও পাঁচটি ছবি আমার মনে আঁকা আছে, চিরকাল থাকবে বোধ হয়।

রাত্রির আর আমার জীবনের পাঁচটি ঘটনা।

১

অন্ধকার। গড়ের মাঠের একটা নির্জ্জন অংশে রাত্রি শুয়ে ছিল, আমি পাশে ব'সে ছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমরা দুজন ছাড়া পৃথিবীতে

আর যেন কেউ নেই, কলকাতা শহরটা তার সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিয়ে আকস্মিকভাবে ক্ষণিকের জন্যে যেন আবির্ভূত হয়েছে, বুদ্বুদের মত এখনই মিলিয়ে যাবে। রাত্রির মনের মধ্যে ঢুকে আমি যেন পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম, অন্ধকার গুহার ভিতরে লোক যেমন পথ হারিয়ে ফেলে তেমনই। মোটরের চীৎকার মশকের গুঞ্জনের মত মনে হচ্ছিল, ক্রমশ তাও আর শোনা যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, চারিদিকের আলো ক্রমশ যেন নিষ্প্রভ হয়ে আসছে, মুমূর্ষু রোগীর নাড়ী ক্রমশ যেমন ক্ষীণ হয়ে আসে। সমস্ত বিশ্বে যেন কিছু নেই, আছে কেবল একটা অনুভূতিময় স্পন্দন, ভেসে চলেছি যেন আমরা দুজনে—মন্থর গতিতে, সেই স্পন্দনের তালে তালে, সময়ের স্রোতে। সময়ের গতিও যেন থেমে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে, চেতনা ধীরে ধীরে অসাড় হয়ে আসছিল। হঠাৎ তার দীর্ঘনিশ্বাস পতনের শব্দে চমকে উঠলাম। হঠাৎ কলকাতা শহর তার সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিয়ে আবার মূর্ত্ত হয়ে উঠল চতুর্দ্দিকে। আলো অন্ধকার সব ফিরে এল। চেয়ে দেখলাম, রাত্রি শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

২

দিনটা মেঘলা ছিল।

নিছক বেড়াবার জন্যেই বেরিয়েছিলাম। দ্রুতগামী একটি ট্রেনের খালি কম্পার্টমেণ্টে ব'সে ছিলাম দুজনে। মেঘের স্তর ভেদ ক'রে যে সূর্য্যালোক সেদিন নেমে এসেছিল পৃথিবীতে, তা যেন আগত নয় আসন্ন, যেন একটা অলৌকিক কিছুর পূর্ব্বাভাষ। এলোমেলো হাওয়াটা সেদিন বইছিল যেন তার অলক আর বসনকে উতলা করবার জন্যেই। তার পরনে ছিল জবাফুলের মত লাল রঙের একটি রেশমী শাড়ি। শাড়ির কোন পাড় ছিল না। মাথায় কোন অবগুণ্ঠন ছিল না। জানলার বাইরে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে ছিল সে। লাল শাড়িতে তার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত, মুখটি শুধু খোলা। মনে হচ্ছিল, মহাকালচারী কোন জলন্ত নক্ষত্রের একটা টুকরো মাধ্যাকর্ষণের টানে হঠাৎ নেমে এসেছে যেন পৃথিবীতে, তার খানিকটা নিবে কালো হয়ে গেছে, বাকিটা জলছে এখনও। দু পাশে

দিগন্তবিস্তৃত ডানকুনির মাঠ। নিউ কর্ডের নূতন লাইন। দ্রুতগামী ট্রেন। গাড়িটা দুলছিল। হঠাৎ সে মুখ ফিরিয়ে চাইলে আমার দিকে, তার নির্নিমেষ চোখে একবার যেন নিমেষপাত হ'ল, কৌতুকদীপ্ত এক কণা হাসি চিকমিক ক'রে উঠল কুচকুচে কালো চোখে, ক্ষণপরেই সে হাসি সংক্রামিত হ'ল অধরে।

আপনার খুব অনুতাপ হচ্ছে, নয়?

বিস্ময়ের ভান ক'রে বললাম, না, আনন্দ হচ্ছে।

সত্যি?

ক্ষণকাল মাত্র কৌতুকদীপ্ত দৃষ্টি আমার মুখের ওপর নিবদ্ধ ক'রে আবার মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল সে। এলোমেলো হাওয়া উদ্দাম হয়ে উঠল তার অলকগুচ্ছে, শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে। কেন আনন্দ হচ্ছে—এ কথা সে জানতে চায় নি; কিন্তু যেহেতু আমার সত্যি সত্যি আনন্দ হচ্ছিল না, অনুশোচনাই হচ্ছিল, তাই আনন্দিত হবার একটা বিশ্বাসযোগ্য কারণ বিবৃত না ক'রে পারলাম না আমি।

আইনকে আইন দিয়েই জব্দ করার মধ্যে একটা আনন্দ আছে বইকি।

আবার সে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চাইলে, চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত্ত।

আপনার আত্মীয়স্বজন? তাঁরাও কি আনন্দিত হবেন এ খবর শুনলে?

সম্ভবত হবেন না। কিন্তু তাঁদের জানাবার দরকার কি? জীবনের অধিকাংশ আনন্দজনক কার্য্যই অভিভাবকদের অজ্ঞাতসারে করতে হয় সকলকে।

আধুনিকতার সুরা পান করেছিলাম বটে, কিন্তু এক চুমুক মাত্র। নেশার চেয়ে ক্ষোভই বেশি হয়েছিল, কিন্তু ভান করতে হচ্ছিল, যেন সত্যি সত্যি নেশা হয়েছে। নেশা যে একেবারে হয় নি, তা নয়; কিন্তু তা আধুনিকতার সুরা পান ক'রে নয়, সনাতন সুরা পান ক'রে। তার সঙ্গে আধুনিকতার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না, তা যুবতীর সম্পর্কে যুবকের আদিম নেশা। কিন্তু সে উন্মাদনাকে আধুনিকতার ছদ্মবেশে নিস্পৃহ

ঔদার্য্যের ভূমিকা অভিনয় করতে হচ্ছিল মিথ্যা আনন্দের আতিশয্য সহকারে।

দ্রুতগামী ট্রেন দুলছিল, দু পাশে দিগন্তবিস্তৃত সবুজ মাঠ মেঘলা দিনের স্নিগ্ধ আলোকে প্রতীক্ষা করছিল যেন কার, এলোমেলো হাওয়া পাগল হয়ে উঠেছিল তার অলকে আর লাল শাড়িতে, আমি চুপ ক'রে ব'সে দেখছিলাম, তার মখমল-কোমল কালো মুখে অনুদ্ভাসিত অপরূপ একটা অরুণিমা উদ্ভাসিত হবার সাধনা করছে।

৩

সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হয়েছিল হঠাৎ আর একদিন।

রাত্রি তার বাবার কাছে যায় নি, যেতে চায় নি। তাকে আলাদা একটা বাসা ক'রে দিয়েছিলাম। বাসাটার সামনে ছোট একটুখানি ফাঁকা জায়গা ছিল। জায়গাটার ওপারে প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়িখানা যাঁর, এই ফাঁকা জায়গাটুকুরও তিনিই মালিক। রাত্রিকে প্রায় সমস্ত দিনই আমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতাম—বাসে, ট্রামে, ট্যাক্সিতে, ট্রেনে। খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল হোটেলে। শোবার জন্যেই কেবল বাড়িটা ভাড়া করতে হয়েছিল রাত্রিরই অভিপ্রায় অনুসারে। সেদিন বিকেলে রাত্রির আসবার কথা ছিল আমার ডিস্পেন্সারিতে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে রইলাম, তবু সে এল না। যে 'কল' দুটি বাকি ছিল, তা সেরে রাত্রির বাসায় গেলাম। গিয়ে দেখি, সামনের মাঠটায় অসম্ভব ভিড়। তিনতলা-বাড়ির মালিকের পিতৃশ্রাদ্ধ, কাঙালী-বিদায় হচ্ছে। অন্ধ, খঞ্জ, নানা ভাবে বিকৃত নানা বয়সের স্ত্রী পুরুষ—ছেঁড়া কাপড়ে, রুখু চুলে, কিলবিল করছে মাঠটায়। সমস্ত স্থানটা দুঃশব্দে ও দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

দেখলাম, রাত্রি মাঠের দিকের কপাট জানলা সব বন্ধ ক'রে দিয়েছে। সম্ভবত ভিড়ের জন্যে বেরোতেও পারে নি।

কড়া নাড়তেই চাকরটা এসে কপাট খুলে দিয়ে গেল। ওপরে উঠে দেখলাম, রাত্রি পড়ছে। আমার কাছে নানা রকম মাসিকপত্র জ'মে ছিল, তারই এক বোঝা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম তাকে।

আজকাল সাহিত্য-সমাজেও খুব দলাদলি, নয় ?

প্রশ্নটার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না, তবু একটা উত্তর দিলাম।

হবে না কেন ? মানুষ, বিশেষত সাহিত্যিকেরা স্বাধীনবুদ্ধিসম্পন্ন জীব। প্রত্যেকেরই স্বাধীন মত আছে এবং তা প্রকাশ করবার অধিকার আছে। সুতরাং দলাদলি তো হবেই।

আপনি কি বলতে চান, স্বাধীন মতের প্রতি নিষ্ঠার জন্যেই এত দলাদলি ? আমার তো নানা কাগজের নানা প্রবন্ধ প'ড়ে মনে হ'ল যে, সাহিত্যের প্রতি নিষ্ঠা কারও নেই, সকলেই মতলববাজ ব্যবসাদার।

এ রকম মনে হওয়ার মানে ?

মানে, যিনি লিখছেন দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে নিয়ে যতক্ষণ না সাহিত্য গঠিত হচ্ছে ততক্ষণ তা খাঁটি সাহিত্য নয়, তিনি নিজে হয় প্রকাশক কিংবা কোন প্রকাশকের বন্ধু, এবং তাঁর আসল উদ্দেশ্য—দরিদ্র জনসাধারণকে নিয়ে লেখা কোন পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেওয়া। আবার এই দেখুন, আর একটা কাগজে দেখছি, একটা প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়—গণসাহিত্য এখনও সৃষ্টি হয় নি এদেশে। এঁর সঙ্গে বোধ হয় প্রথম প্রবন্ধ-লেখকের শত্রুতা আছে। আর একটা কাগজ প্রগতি-সাহিত্য নিয়ে মাতামাতি করছেন, এঁরও উদ্দেশ্য—

তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলাম, আহা, এরা সবাই যে মতলববাজ, এ সন্দেহ হ'ল কি ক'রে তোমার ? ওসব প্রবন্ধে যে যুক্তি আছে, সেগুলো কি অর্থহীন ?

একটু হেসে রাত্রি বললে, বুদ্ধিমান লোকে যে কোন জিনিসের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে অনায়াসে একটা যুক্তি খাড়া করতে পারে, ভাল উকিল দোষীকেও মাঝে মাঝে বেকসুর খালাস করিয়ে আনে, তাই ব'লে সত্য মিথ্যা হয়ে যায় না। যারা মানুষকে ভালবাসে, তারা যেমন মানুষের জাত বিচার করতে বসে না, তেমনই যারা সত্যিকার সাহিত্য-রসিক, তারা সাহিত্যের জাত নিয়ে মাথা ঘামায় না। মানুষের সুখ দুঃখ প্রেম ঘৃণা আশা আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ মানুষের জীবন নিয়েই সাহিত্য। সে মানুষ ধনী কি গরিব, রাজরাণী কি মেথরানী—এ নিয়ে যারা বেশি

মাতামাতি করে, তারা—জানবেন, চণ্ডীমণ্ডপবাসী ঘোঁট-পাকানো মতলববাজ চাঁইদের সগোত্র। তারা ব্যবসাদার, সাহিত্যিক নয়।

ওয়েটিং-রুমে রাত্রির সঙ্গে সাহিত্য-আলোচনা হবার পর আর সাহিত্যপ্রসঙ্গ তার কাছে তোলবার সাহস ছিল না আমার। মাসিক-পত্রগুলো তার কাছে এনে দিয়েছিলাম অবশ্য ক্ষীণ একটা আশা নিয়ে। সাহিত্যবিষয়ক দুচারটে প্রবন্ধ ইদানীং লিখেছিলাম এবং প্রোলিটারিয়েট সাহিত্য নিয়েই লিখেছিলাম। রাত্রির মুখে এই মন্তব্য শুনে আমি মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম, আমার ওই লোক-ভোলানো সস্তা উচ্ছ্বাসগুলো ওর চোখে যেন না পড়ে। কোন ওজুহাতে মাসিকগুলো সরিয়ে নিয়ে যাব আমি এখান থেকে।

জ্যোতির্ময়ের যে ছবিখানা এন্‌লার্জ করতে দিয়েছিলাম, সেটা হয়েছে ?

কবে দেবার কথা ছিল ?

আজই।

চল, তবে বেরোনো যাক।

ওই নোংরা ভিড় ঠেলে আমার আজ বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে না, আপনিই গিয়ে নিয়ে আসুন।

তার আদেশ—হ্যাঁ, আদেশই—অগ্রাহ্য করবার মত মানসিক শক্তি আমার ছিল না। সে আদেশ করবে না কেন, কিছুই সে লুকোয় নি, জ্যোতির্ময়ের সম্বন্ধে কোন কথাই সে আমার কাছে গোপন করে নি। সমস্ত জেনেশুনেই আমি তাকে—না, ভুল বলছি—আমি তাকে প্রশ্রয় দিই নি, সেই আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। আমি সব জেনেশুনেও অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলাম, সে তা গ্রহণ ক'রে কৃতার্থ করেছিল আমাকে। আদেশ করবে না কেন ?

বেরিয়ে এলাম। ভিড় ঠেলে রাস্তায় গিয়ে পড়লাম অনেক কষ্টে। গলির বাঁকে অদৃশ্য হবার পূর্ব্বে ঘাড় ফিরিয়ে যে ছবিটা দেখলাম, তা আমার মনে স্পষ্টভাবে আঁকা আছে এখনও। দোতলার বারান্দায় নির্ব্বিকারভাবে রেলিঙে ভর দিয়ে রাত্রি দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পায়ের নীচে অসংখ্য ভিখারী।

৪

টেলিফোনের ঝনৎকারে ঘুম ভেঙে যখন উঠে বসলাম, তখন রাত দুটো। কলকাতা শহরও তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার শোবার ঘরের জানলা দিয়ে যে আকাশটুকু দেখা যায়, তাতে সহসা বিদ্যুতের চমক দেখতে পেলাম। সোঁ সোঁ ক'রে একটা হাওয়া উঠল। সেদিন সমস্ত দিন রাত্রির সঙ্গে দেখা হয় নি। বিকেলে গিয়েছিলাম, দেখা পাই নি, একাই সে কোথায় বেরিয়েছিল। মনে হ'ল, রাত্রিই হয়তো ফোন করছে কোথাও থেকে। গোকুল এসে বললে, নবীনবাবু—

নবীনবাবু লোকটি কে, ভাববার চেষ্টা করলাম। রোগীদের নাম আর পেটেন্ট ওষুধের নাম মনে রাখা এমন এক দুঃসাধ্য ব্যাপার! অথচ এই দুটি জিনিসই আমাদের পেশার পক্ষে অপরিহার্য্য। সহসা মনে পড়ল। নবীনবাবু পূর্ণেন্দুবাবুর মামাতো ভাইয়ের নাম। নেমে এলাম বিছানা থেকে। টিপটিপ ক'রে বৃষ্টিও নামল, হাওয়ার বেগ বাড়ল।

ফোনে নবীনবাবু বললেন, দাদা কেমন যেন করছেন, আপনি দয়া ক'রে শিগগির আসুন একবার।

রাত দুটোর সময় যেসব রোগী কেমন যেন করে, তাদের অনেকের কথা জানি, কারও বেলাতেই দয়া করতে ত্রুটি করি নি, কিন্তু—। মনের ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ সুরটা সহসা ভোঁতা হয়ে গেল, যখনই ভাল ক'রে মনে পড়ল, পূর্ণেন্দুবাবু স্বর্ণেন্দুর বাবা।

তাড়াতাড়ি জামা জুতো প'রে স্টেথোস্কোপ আর ব্যাগটা হাতে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম—হঠাৎ যদি কোন ট্যাক্সি পাওয়া যায়, এই ভরসায়। কলকাতা শহরেও অত রাত্রে যান-বাহন সুলভ নয়। ফুটপাথ দিয়ে জোরেই হাঁটতে লাগলাম। বিরাট কর্নওয়ালিস স্ট্রীট জনশূন্য। টিপটিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল, হাওয়া বইছিল বেশ জোরে। রাত্রির কথা মনে পড়ল। বিশেষভাবে আরও এইজন্যে মনে পড়ল যে, এসে থেকে রাত্রি পূর্ণেন্দুবাবুর কাছে যায় নি। কেন যায় নি, এ প্রশ্ন তাকে করেছিলাম। উত্তরে সে যা বলেছিল, তা নিখিল চৌধুরীর কাছে

হয়তো সন্তোষজনক ব'লে মনে হতে পারত, কিন্তু আমার কাছে অসম্পূর্ণ ব'লে মনে হয়েছিল। বলেছিল, গেলে উনি হয়তো দাদার কথা জানতে চাইবেন; কিন্তু বলার ধরনে কেমন যেন একটা কপটতা ছিল। এ কপটতার কারণ যে কি, তার আভাস আমার অজ্ঞাত ছিল না; অবশ্য তা আভাস মাত্র। রাত্রি এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত কেন যে দেয় নি, সেই কথাই ভাবতে ভাবতে চলেছিলাম। কতক্ষণ যে চলেছিলাম, তা ঠিক মনে নেই, শুধু মনে আছে, টিপটিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল, ফাঁকা ফুটপাথ দিয়ে রাত্রির কথা ভাবতে ভাবতে একা হেঁটে চলেছিলাম।

শাঁখারিটোলায় নবীনবাবুর বাসায় যখন পৌছলাম, নবীনবাবু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বললেন, কেমন যেন নিঝুম হয়ে পড়েছেন। ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখলাম, জীবন্ত চোখটাও মিনতি করছে, যাঁর ঘুম হ'ত না, মহানিদ্রা নেমেছে তাঁর চোখে, সমস্ত মুখমণ্ডলে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাব ফুটে উঠেছে। পূর্ণেন্দুবাবু মারা গেছেন।

ফেরবার সময় একটা ট্যাক্সি পেলাম। মনে হ'ল, রাত্রিকে খবরটা দিয়ে যাওয়া আমার কর্ত্তব্য। রাত্রির বাসায় পৌছে বিস্মিত হয়ে গেলাম। রাত্রি তখনও জেগে আছে। জানলা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখনও টিপটিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল, জোরে হাওয়া বইছিল, গলির মোড়ে অপেক্ষমান ট্যাক্সিটার হেড-লাইটের আলো নিঃশব্দে অন্ধকারকে বিদীর্ণ করছিল, আমি রাত্রির জানলার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলাম। রাত্রি এতক্ষণ পর্য্যন্ত জেগে আছে কেন? মুহূর্ত্তের মধ্যে সম্ভব অসম্ভব নানা কারণ মনের মধ্যে ভিড় ক'রে এল, চ'লে গেল। কড়া নাড়লাম।

রাত্রি জানলায় উঠে এল।

কে?

আমি।

আপনি এত রাত্রে?

চাকরটাকে না জাগিয়ে নিজেই নেমে এসে দরজা খুলে দিলে।

এত রাত্রে হঠাৎ যে?

ওপরে চল, বলছি। তুমি এখনও জেগে আছ কেন?

চিঠি লিখছিলাম।

কাকে ?

ফার্নাণ্ডিজকে।

এমন সহজভাবে বললে, যেন ফার্নাণ্ডিজকে আমি চিনি আর সে কথা ও জানে। নিমেষের মধ্যে মানসপটে অনেক দিন আগেকার একটা ছবি ফুটে উঠল—কলুটোলার মোড়ে স্বর্ণেন্দু, তার হাতে খবরের কাগজে মোড়া টকটকে লাল থাপে ঢাকা ছোরা, রাত্রির জন্মদিনে ফার্নাণ্ডিজের উপহার।

যেন কিছুই জানি না, এমনই ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, ফার্নাণ্ডিজ কে ?

ফার্নাণ্ডিজ আমাদের ড্রাইভার ছিল। আমাদের পুরোনো বাসাটার খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম আজ সকালে, সেখানে দেখলাম, আমার নামে ফার্নাণ্ডিজের একটা চিঠি রয়েছে আর এই ফোটোখানা।

টেবিলের ওপরেই ফোটোখানা রাখা ছিল। দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠগঠন একজন হাবসী। ছবিটার দিকে চেয়ে রইলাম নির্নিমেষে।

হঠাৎ জানলা দিয়ে দমকা একটা হাওয়া ঢোকাতে চিঠি লেখবার প্যাডের পাতাগুলো ফরফর ক'রে উড়তে লাগল। দেখলাম, রাত্রি ফার্নাণ্ডিজকে দীর্ঘ পত্র লিখেছে। কি লিখেছিল, আমি দেখি নি। রাত্রি একটা বই নিয়ে প্যাডটার ওপর চাপা দিলে।

বললাম, পূর্ণেন্দুবাবু মারা গেলেন এখুনি।

রাত্রি শুনে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

তারপর অনেকক্ষণ পরে বললে, শান্তি পেলেন এতদিনে।

একটুও কাঁদলে না।

তারপর হঠাৎ বললে, আচ্ছা, একটা স্যুটকেস আপনার বাসায় রেখে গিয়েছিলাম সেবারে, সেটা আছে তো ?

আছে।

কাল নিয়ে আসতে হবে সেটা।

আচ্ছা।

পরস্পরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। বাইরে টিপটিপ

ক'রে বৃষ্টি পড়তে লাগল, জোরে জোরে হাওয়া বইতে লাগল, প্রকাণ্ড ট্যাক্সিখানা নীরবে অপেক্ষা ক'রে রইল নীচের গলিটাতে খানিকটা পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মত।

৫

সিনেমায় ভাল একখানা বই ছিল।

সকাল থেকেই কাজকর্ম্ম এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিলাম, যাতে সন্ধ্যাবেলায় অবসর থাকে। পাশাপাশি দুখানা সীট আগে থেকে 'বুক' ক'রে রেখেছিলাম। যথাসময়ে রাত্রির বাসায় গিয়ে কড়া নাড়লাম। কোন সাড়া পেলাম না। হাতঘড়িটা দেখলাম, আর মাত্র আধ ঘণ্টা দেরি আছে। ট্যাক্সি ক'রে না গেলে সময়ে পৌছানো যাবে না। আবার কড়া নাড়লাম, এবার একটু জোরে জোরে। ছোঁড়া চাকরটা নেমে এল। কপাট খুলে দিয়ে বললে, মায়ের অসুখ করেছে।

অসুখ করেছে ? তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম। সামনের ঘরে কাউকে দেখতে পেলাম না। ডাকলাম, সাড়া পেলাম না। শোবার ঘরে ঢুকে দেখলাম, সেখানেও কেউ নেই। আবার ডাকলাম, সাড়া নেই। এদিক ওদিক খুঁজে শেষে বাথরুমের পাশে অন্ধকার ছোট যে ঘরটা ছিল, সেই ঘরটায় ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঘরটার অন্ধকার কোণে রাত্রি উপুড় হয়ে প'ড়ে ছিল। প্রসব-বেদনাতুরা রাত্রি। কাঁদছিল না, কাঁপছিল না, নিয়তির কাছে নিজেকে সমর্পণ ক'রে দিয়ে নির্ব্বাক নিস্পন্দ হয়ে প'ড়ে ছিল। আমিও নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। রাত্রি আমার পদশব্দ শুনতে পেয়েছিল। বেশবাস সম্বৃত ক'রে আস্তে আস্তে উঠে বসল, তারপর আমার মুখের দিকে নিনিমেষ চাহনি নিবদ্ধ ক'রে সহজ কণ্ঠে বললে, আজ হবে। আমি আরও ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আমাকে ডাক্তারী বিবেকের তাড়নায় ছুটে বেরিয়ে আসতে হ'ল। যে ধাত্রীটিকে ঠিক ক'রে রেখেছিলাম, তারই উদ্দেশে ছুটতে হ'ল ট্যাক্সি নিয়ে।

রাত্রি বারোটার পর নির্ব্বিঘ্নে রাত্রির সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল।

আমি তার নামকরণ করলাম, প্রভাত।

দশম পরিচ্ছেদ

এর পর যেসব বর্ণনা গল্পলেখকের লেখনীতে অনর্গলভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা অবশ্যম্ভাবী, সেসব বর্ণনা আমি করব না। বসন্তের যাদু-স্পর্শে শুষ্ক তরু যেমন মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে, অদৃশ্য শক্তির লীলায় পাথর বিদীর্ণ ক'রে যেমন নির্ঝর নিঃসৃত হয়, বর্ষাসমাগমে শীর্ণ স্রোতস্বতী যেমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে দুকূল প্লাবিত ক'রে ছোটে, সন্তান লাভ ক'রে রাত্রিরও মাতৃহৃদয় তেমনই—এই জাতীয় বর্ণনা রাত্রির সম্পর্কে আমি করতে পারব না ; কারণ তা মিথ্যা হবে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, সন্তান প্রসব ক'রে রাত্রি মুঞ্জরিত হয়ে উঠে নি, নির্ঝরের চপলতা লাভ করে নি, নদীর মত দুকূলপ্লাবিনী হয় নি। রাত্রি কেমন যেন শুকিয়ে গিয়েছিল, কেমন যেন মুষড়ে পড়েছিল, তার নির্ভীক সত্তা কেমন যেন নির্জ্জীব হয়ে এসেছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, একটা আকাশচারী ব্যোমযানকে কে যেন গুলি ক'রে মাটিতে নামিয়ে এনেছে। তার চোখের দৃষ্টিতে যে ভাষা ফুটে উঠেছিল, তাতে মাতৃহৃদয়ের স্নিগ্ধতা ছিল না, ছিল শরাহত ভগ্নপক্ষ বিহঙ্গমের মৌন বিলাপ। তার সারাদিন শান্তি ছিল না, সারারাত ঘুম ছিল না। ওই মাংসপিণ্ডটার প্রতি মুহূর্ত্তের অসংখ্য দাবি মেটাবার জন্য অহরহ তাকে যে প্রাণপাত করতে হ'ত, তার মধ্যে মহনীয় কিছু আমি দেখতে পাই নি, আমার মনে হ'ত, অমোঘ আইনের কবলে প'ড়ে সে যেন সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করছে। তার মলিন মুখ, শঙ্কিত দৃষ্টি, শীর্ণায়মান দেহ, অন্তরের নিদারুণ গ্লানি সত্ত্বেও বাইরের ছদ্ম-সপ্রতিভতা—না, মহনীয় কিছুই ছিল না।

প্রভাত কি তার মায়ের বন্দীত্বের ব্যথা অনুভব করেছিল ? আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, করেছিল। শিশুকে আমরা যত অবোধ ভাবি, হয়তো সে সত্যিই তত অবোধ নয়। আমার মনে হয়, প্রভাত তার মায়ের ব্যথা বুঝেছিল, কোন নিগূঢ় উপায়ে বুঝেছিল, তাই সে তার মাকে মুক্তি দিয়ে চ'লে গেল। তা না হ'লে অমন সুন্দর সুস্থ শিশুর হঠাৎ মৃত্যু হ'ল কেন ?

অসুস্থ হয়ে পশ্চিমের এই শহরটায় বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্যে এসে স্মৃতি-মন্থন ক'রে যে কাহিনী আমি লিপিবদ্ধ করছি, এখন মনে হচ্ছে, তার কতটুকু আমি জানি ! সবই তো অস্পষ্ট। কল্পনায় বাস্তবে, আলোয় আঁধারে মিশিয়ে যে ছবি আমি আঁকলাম, তার কতটুকু কল্পনা, কতটুকু বাস্তব, কতটুকু আলো, কতটুকু আঁধার, কিছুই তো জানি না—সমস্তটাই আমার মনের বিকার কি না, কে জানে ! সবই মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু একটা অবিসংবাদিত সত্যকে আমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না, আমি মোহগ্রস্ত। মোহের মায়াময় অঞ্জন চোখে লাগিয়ে হয়তো আমি কুৎসিতকে সুন্দর, পাপকে পুণ্য, অসত্যকে সত্য রূপে দেখেছি এবং অপরকে দেখাতে চেষ্টা করেছি। বর্ত্তমান যুগের এই সর্ব্বনাশা মনোবৃত্তি হয়তো আমাকেও পেয়ে বসেছে। অন্যায়কে অন্যায় জেনেও, নিজের দুর্ব্বলতার জন্যে লজ্জিত না হয়ে তাকে সুন্দর ক'রে আঁকবার চেষ্টা করেছি কেবল আমার লেখবার শক্তি আছে ব'লে। বুঝছি, কিন্তু নিরস্ত হতে পারছি না।

তেতলার একটা ঘরে ব'সে লিখছি। দূর দিগন্তে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, ও পাশের সাদা স্তূপ মেঘটার সর্ব্বাঙ্গে অভ্র-আবীর। সারি সারি পাখী উড়ে চলেছে, দলে দলে গরু ফিরে আসছে মাঠ থেকে, নদীপারের তালবনে সোনার স্বপ্ন নেমেছে যেন, তালবনের ওপারে ঘননীল মেঘটার গায়ে আলোর জরি জ্বলছে।

ডি. কে.র কথাগুলো মনে পড়ছে।

তাঁরা দুজনে পাপপুণ্যের সমস্ত বোঝা ফেলে রেখে মানস-সরোবরের উদ্দেশ্যে চ'লে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম, তাঁরা দুজনে চড়াই ভাঙতে ভাঙতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

হিমালয়ের পথে রাখালবাবুর আর স্বর্ণেন্দুর মায়ের সঙ্গে ডি. কে.র নাকি দেখা হয়েছিল। আলাপও হয়েছিল। ডি. কে. জানত না যে, আমার সঙ্গেও তাঁদের আলাপ ছিল। তাই সে কলকাতায় ফিরে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাদের গল্প করছিল আমার কাছে।

আশ্চর্য্য লোক ভাই রাখালবাবু, নিজের ভ্রষ্টা স্ত্রীকে ভ্রষ্টা জেনেও একদিনের জন্যে ত্যাগ করে নি।

আমি নীরবে শুনে যাচ্ছিলাম, কিছু বলি নি, কিন্তু আমার চোখের দৃষ্টিতে ভ্রূর কুঞ্চনে বোধ হয় বিস্ময় ফুটে উঠেছিল।

বিশ্বাস হচ্ছে না তোর? তুই ভাবছিস আমি কেমন ক'রে জানলাম? রাখালবাবুর স্ত্রীই নিজে আমাকে বলেছিলেন একদিন। কেদারবদরির পথে একটা চটিতে ছিলুম আমরা। অদ্ভুত জ্যোৎস্না উঠেছিল সেদিন। হঠাৎ রাখালবাবুর স্ত্রী কেমন যেন ক্ষেপে গেলেন। চুল এলো ক'রে, চোখ বড় বড় ক'রে—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার ভাই। হঠাৎ আমাকে বললেন, না, আমি পাপের বোঝা বুকে নিয়ে কেদারনাথে যেতে পারব না, ফেটে ম'রে যাব; তুমি শোন, তোমার কাছে ব'লে হালকা হই আমি। এই ব'লে বলতে লাগলেন—আমার জ্যোতির্ম্ময় যখন এক বৎসরের, সেই সময় পূর্ণেন্দুবাবু ব'লে একজন লোকের সঙ্গে আলাপ হয় আমাদের, আলাপ ক্রমশ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হ'ল। ঘনিষ্ঠতা শেষটা এমন দাঁড়াল যে, নিজের পেটের ছেলেকে ফেলে রেখে আমি পালিয়ে গেলাম তার সঙ্গে। পূর্ণেন্দুবাবুর কাছে অনেক দিন ছিলাম, অনেকে আমাকে পূর্ণেন্দুবাবুর স্ত্রী ব'লেই জানে।

এই সময় ফোনটা ঝনঝন ক'রে বেজে উঠেছিল, ধীরেনকেই কে যেন ডাকছিল ফোনে জরুরী দরকারে। ধীরেন গল্পটা অসমাপ্ত রেখেই চ'লে গিয়েছিল, ব'লে গিয়েছিল, আর একদিন এসে বাকিটা বলবে। এখনও ফেরে নি। শুনেছি, সঙ্গী পেয়ে সে দক্ষিণভারত ভ্রমণে গেছে। মানস-সরোবরে যেতে পারে নি ব'লে সক্ষোভে গোড়াতেই রাখালবাবুদের সম্বন্ধে যে কথাগুলো সে বলেছিল, সে কথাগুলোই বারবার মনে পড়ছে আমার—তাঁরা দুজনে পাপপুণ্যের সমস্ত বোঝা ফেলে রেখে মানস-সরোবরের উদ্দেশ্যে চ'লে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম, তাঁরা দুজনে চড়াই ভাঙতে ভাঙতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

উত্তর দিকের পালক-মেঘগুলোতেও রঙের ছোঁয়াচ লেগেছে, দেখতে দেখতে সব গোলাপী হয়ে গেল। তালবনের ওপারের ঘননীল মেঘটা

বেগুনী হয়ে আসছে ক্রমশ, আলোর জরিতে আগুন জলছে। একটা পাঁশুটে রঙের মেঘ সূর্য্যকে আড়াল করেছে, আলোর ফিনিক ছুটছে তার চারদিক দিয়ে।

নিখিল চৌধুরী যে দিন রাখালবাবুর উইলটা আমাকে এনে দেখিয়েছিলেন, সেদিনের কথাও মনে পড়ছে আমার আজ। রাখাল-বাবু মহাপ্রস্থানে যাবার আগে একটা উইল ক'রে নিখিল চৌধুরীর নামে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তিনি জ্যোতির্ম্ময় আর রাত্রিকে সমান ভাগে ভাগ ক'রে দিয়েছিলেন। পূর্ণেন্দু-বাবুর জন্যেও ব্যবস্থা ছিল—তিনি যত দিন বাঁচবেন, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবার মতন খরচ পাবেন। পূর্ণেন্দুবাবুর মৃত্যুসংবাদ তিনি পান নি বোধ হয়। নিখিলবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলেন, রাত্রির ঠিকানা আমি জানি কি না। ঠিকানা আমি জানতাম না, তাই বলতে পারি নি। প্রভাতের মৃত্যুর দুদিন পরেই রাত্রি চ'লে গিয়েছিল। কোথায়, তা আমি জানি না।

আজও কিন্তু আমি তার প্রতীক্ষা করি। অসামাজিকভাবে নয়, সামাজিক দাবিতেই। আইনের চক্ষে আমি তার স্বামী। জ্যোতির্ম্ময়ের সন্তানের জারজ-অপবাদ-মোচনের জন্য আইনত আমি তাকে বিবাহ করেছিলাম। আমি জানি, সে আসবে না। এও আমি জানি, আমার জন্যে নয়, নিজের সন্তানের জন্যেই এবং আমার প্রবল আগ্রহাতিশয্যে এ বিবাহে সে সম্মত হয়েছিল।

তবু তার প্রতীক্ষা করি।

দূর দিগন্তরেখায় তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ তপন ধীরে ধীরে নামছে। অস্তরাগরঞ্জিত মেঘমালার বর্ণবৈচিত্র্য নিষ্প্রভ হয়ে আসছে ক্রমশ। অন্ধকারের আগমনী শুনতে পাচ্ছি।

রাত্রি আসন্ন।

সমাপ্ত

"বনফুল"

দক্ষিণ পাড়ার মেয়েরা

রমিতা রায় শমিতা সরকার সজ্ঘমিত্রা বোস	দক্ষিণ পাড়ার মেয়েরা		
জগৎ সেন চৌধুরী	উত্তর পাড়ার ছেলেরা	—	দ্বিতীয় অঙ্কে ছদ্মবেশে পুলিস- ইন্সপেক্টরত্রয়
হেমন্ত মধু হরিশ	উত্তর পাড়ার ছেলেদের মোটর ড্রাইভার	—	ডক্টর থাসনবীশ মিঃ সরকার মিঃ দাশ ছদ্মবেশী আমেরিকা- প্রত্যাগত বিশিষ্ট ব্যক্তি

জগসিন্ধুবাবু—রমিতার পিতা

তস্য গৃহিণী

সময় :—প্রথম অঙ্কে—একদিন বিকাল ও সন্ধ্যা।

দ্বিতীয় অঙ্কে—সেইদিন মধ্যরাত্রি ও শেষরাত্রি।

স্থান :—প্রথম অঙ্কে—দক্ষিণ পাড়া, রমিতার বাড়ি।

দ্বিতীয় অঙ্কে—লেকের ধার।

প্রথম অঙ্ক

ভারতবর্ষের কোন একটি সুপ্রসিদ্ধ শহরের দক্ষিণ পাড়া। পাড়ার সবচেয়ে বড় বাড়িটি জগসিন্ধুবাবুর; তিনি ধনী—এই তথ্য পাড়ার অধিবাসী হইতে সুরু করিয়া তাঁর বাড়ির চাকর দাস দাসী মায় আসবাবপত্র পর্য্যন্ত ঘোষণা করিয়া থাকে; সম্পত্তি তাঁর প্রচুর,

কলিকাতায় অনেকগুলি বাড়ি, একটি মেয়ে, খানকয়েক মোটর-গাড়ি, একটি গৃহিণী; মেয়েটির নাম রমিতা; কলেজের চৌকাঠ ডিঙাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকিয়াছে; পাড়ার অধিকাংশ যুবকের বুক চিরিয়া ফেলিলে দেখা যাইবে, দুইটি ফুসফুস ও একটি হৃৎপিণ্ডে রক্তাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে 'রমিতা রয়'; কিন্তু রমিতা কারও জন্য রয় না, সে সদাই প্রবহমানা, আর তার অববাহিকা দুই বন্ধুনী—শমিতা ও সঙ্ঘমিত্রা। তারাও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী; পাড়ার যুবকেরা তাদের দেখিলেই নিজেদের মধ্যে উচ্চস্বরে বলিয়া থাকে—"হোলি ট্রিনিটি"। আধুনিকাদের বেশভূষা ও চেহারা বর্ণনায় আমি অপটু, অধিকাংশ জামা ও শাড়ির নামই জানি না; দেহগৌরবে গুরুত্বের অত্যন্ত অভাব; সদ্য-দোহিত দুধে যেমন দুধের চেয়ে ফেনার প্রাচুর্য্য, ওদের দেহে তেমনই বস্তুর লঘুতাকে সৌন্দর্য্যে পুরাইয়া রাখিয়াছে; কথায় বার্ত্তায়, চলনে বলনে, হাস্যে লাস্যে, ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে মুহুর্মুহু উপচিয়া পড়িতেছে; তিনজনেই অবিবাহিত—ফলে দক্ষিণ পাড়ার তথা বাংলা দেশের অধিকাংশ যুবক আশায় আশায় (হায় দুরাশা!) এখনও কোন রকমে জীবন ধারণ করিয়া আছে।

জগসিন্ধুবাবুর বাড়ির ড্রয়িং-রূম, বড় বড় আসবাবের দোকানের যত আবর্জ্জনা সব এখানে সমবেত; পিছনের দরজা দিয়া দোতলার সিঁড়ির কিয়দংশ চোখে দেখা যায়; দু পাশে দুটি দরজা, পর্দ্দা খাটানো; মাঝে মাঝে পর্দ্দা উড়িয়া গেলে দু পাশে দুটি সুসজ্জিত কক্ষ চোখে পড়ে।

শহরের উত্তর পাড়ার সম্ভ্রান্ত বংশের একটি যুবক জগসিন্ধুবাবুর আহ্বানে রমিতাকে দেখিতে আসিয়াছে; যুবকটির নাম জগৎ সেন; সে শিক্ষিত, ধনী, সুপুরুষ; সঙ্গে তার দুই বন্ধু সেন ও চৌধুরী; তারাও সম্ভ্রান্ত, অর্থাৎ নিজেদের উপার্জ্জনের আবশ্যক নাই।

তারা তিনজনে অত্যন্ত বিরক্ত, ক্ষুব্ধ, রুষ্ট হইয়া পাশের ঘরের পর্দ্দা ঠেলিয়া ড্রয়িং-রূমে প্রবেশ করিল; তাদের কথাবার্ত্তায় ও চেহারায় মনে হইতেছে, ঘোরতর বিক্ষোভের কারণ ঘটিয়াছে। দু চার মুহূর্ত্ত ইংরেজীতেই কথাবার্ত্তা চলিল; তারপর বাংলায়, অত্যন্ত হৃদয়াবেগের ঠেলায় নাকি অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়া মাতৃভাষা বাহির হইয়া পড়ে শোনা যায়—বোধ হয় তারই লক্ষণ

জগৎ। ইম্পসিব্‌ল।

সেন। অ্যাব্‌সার্ড।

চৌধুরী। সি দি ইম্পার্টিনেন্স।

জগৎ। প্রিপস্টারাস।

সেন। আন্‌থিংকেবল।

চৌধুরী। দাও হে জগৎ, একটা কেস ক'রে দাও।

জগৎ। একজ্যাক্টলি। আমিও তাই ভাবছি।

সেন। না না, ওসবের মধ্যে গিয়ে কাজ নেই। জেরায় অনেক কিছু বেরিয়ে যাবে।

চৌধুরী। সে ভাবনা তো ওদের।

সেন। আমাদেরও বটে। আমাদের তো স্বীকার করতে হবে যে, বিয়ের জন্যে মেয়ে দেখতে গেলে মেয়ে বর পছন্দ করে নি।

চৌধুরী। তাতে অপমানটা কিসের? এই আমাদের জগৎ সেনের মত বরকে যে অপছন্দ করে, লজ্জার যদি কিছু থাকে তবে তা সেই মেয়ের।

সেন। ওটা তো আমাদের দিকের কথা হ'ল। কিন্তু পরের দিন যখন ইংরেজী-বাংলা খবরের কাগজের আইন-আদালতের স্তম্ভে সরস বিবরণ বেরুবে, তখন কেমন লাগবে? হয়তো এই নিয়ে সেদিনকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধই বা লিখিত হবে। তুমি কি বল জগৎ?

জগৎ। কথাটা ভাই, মিথ্যে নয়।

চৌধুরী। কিন্তু কিছু করতে হবে তো।

সেন। সে তো একশো বার।

চৌধুরী। চল, তা হ'লে এক কাজ করা যাক। আমরা তো তিনজন আছি, ধ'রে কিছু দেওয়া যাক।

সেন। কাকে—মেয়েকে নাকি?

চৌধুরী। আরে ছিঃ ছিঃ, মেয়ের বাপ—জগসিন্ধুবাবুকে।

জগৎ। না হে, আমি যতটা বুঝেছি, মেয়ের বাপ এর মধ্যে নেই।

সেন। একজ্যাক্টলি। সে ভদ্রলোক আমাদের চেয়ে বেশি অপ্রস্তুত হয়েছে।

জগৎ। আমার সবচেয়ে বেশি রাগ হচ্ছে মিস রমিতা রায়ের দুই বন্ধুনীর ওপরে। তাদের ভাবখানা লক্ষ্য করেছিলে?

সেন। ওই যে ডান দিকে যে কটা-চোখ মেয়েটা দাঁড়িয়ে ছিল, তার আস্পর্দ্ধাটা দেখ, বলে কিনা—আপনারা থাকেন শহরের উত্তর পাড়ায় আর বিয়ে করতে এসেছেন দক্ষিণ পাড়ায়? এ যে একেবারে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুতে অভিযান!

চৌধুরী। আর সেই ঢ্যাঙা মেয়েটার কথা মনে আছে? বলে কিনা—জগৎবাবু আপনার কি থাইসিস আছে? আরে ম'লো, থাইসিস থাকলে কি আর কেউ নতুন ক'রে বীজাণু সংগ্রহ করতে আসে!

সেন। উত্তর পাড়ায় বাস করা যে এতবড় অপরাধ, তা এর আগে কে জানত!

জগৎ। সে আপসোস পরে ক'র; এখন কি করবে তাই ভাবো।

চৌধুরী। কি আর করবে? কেস নয়, ঘুষি নয়, তবে কিল হজম ক'রে বাড়ি ফিরে চল। গিয়ে বললেই হবে যে, মেয়ে পছন্দ হ'ল না।

জগৎ। সেন, কিছু কর, অমনই ফিরছি না।

সেন। নিশ্চয়ই নয়। আমাদের তিনজনের তিনখানা কারের তিন-জন ড্রাইভার তো বাইরেই হাজির আছে। কি বল?

চৌধুরী। তা আছে। তারা কি করবে?

সেন। যা করবার তারাই করবে। জেনে রেখে দাও, এ যুগ হচ্ছে মোটর-ড্রাইভারদের যুগ। মোটরের মালিকরা যা পারে না, ড্রাইভারেরা তা দিব্যি পারবে।

চৌধুরী। বুঝিয়ে বল।

সেন। অত জোরে নয়। শোন, ওদের তিনজনকে একটু সাজিয়ে

পাঠিয়ে দিতে হবে। দেখো, কিছুক্ষণের মধ্যেই মিস রমিতা রায় আর তার দুই বন্ধুকে ওরা কেমন অনায়াসে মুঠোর মধ্যে এনে ফেলবে। সেটাই হবে উপযুক্ত প্রতিশোধ।

জগৎ। সে কি ক'রে সম্ভব? এমন কাল্‌চারড ঘরে?

সেন। রাখো। রাখো। কাল্‌চারের এনামেলের তলায় রয়েছে অশিক্ষিতের মন।

এমন সময়ে বৃদ্ধ জগসিন্ধুবাবু কোঁচার খুট গলায় দিয়া অত্যন্ত বিব্রতভাবে প্রবেশ করিলেন

জগসিন্ধু। আমি আগেই আসতাম, ওদের বোঝাচ্ছিলাম, যা হবার হয়েছে, যাও, এখন ক্ষমা চেয়ে এসগে! নাঃ, কিছুতেই হ'ল না।

চৌধুরী। নিন নিন, অনেক মায়াকান্না দেখেছি। ডেকে এনে অপমান! কেস করব। আপনাকে সপরিবারে আসামীর কাঠ-গড়ায় চড়াব।

জগসিন্ধু। সবই বলতে পারেন—অপরাধ তো করেইছি।

চৌধুরী। ভাবছেন, অপরাধ স্বীকার করলেই চুকে গেল? আগে ঘর ঠিক ক'রে তবে ভদ্রলোককে ডাকতে হয়। জগৎ সেনের জুতোর ফিতে খুলে দেবার যোগ্যতাও আপনার মেয়ের নেই, তা জানবেন।

জগসিন্ধু। আমারও নেই।

সেন। আর রাগারাগি ক'রে কি হবে, চল।

জগসিন্ধু। আমি বুড়ো মানুষ, আমাকে ক্ষমা ক'রে যাবেন।

চৌধুরী। বুড়ো মানুষ! সেটাও যেন আপনার একটা যোগ্যতা হ'ল!

সেন। আচ্ছা সার্, আসি।

জগসিন্ধু। দয়া ক'রে ক্ষমা ক'রে যাবেন।

চৌধুরী। দেখা যাবে আপনার মেয়ের বিয়ে হয় কি ক'রে।

সেন। আঃ, কি বকছ? চল না।

বন্ধুত্রয়ের প্রস্থান

জগসিন্ধুবাবুর পত্নীর প্রবেশ—বর্ষীয়সী মহিলা

গৃহিণী। গিয়েছে? বাঁচা গিয়েছে। যে রকম অসভ্যের মত চীৎকার করছিল, ভাবলাম, কি জানি তোমাকে মারধোর বা করে!

জগসিন্ধু। এর চেয়ে যে মারা অনেক ভাল ছিল। ছি ছি ছি! মাথা কাটা গেল! মাথা কাটা গেল!

গৃহিণী। অমন করছ কেন বাপু? মেয়ের যদি পছন্দ না হয়! এক মেয়ে, তাকে কি সাধ ক'রে জলে জঙ্গলে ফেলে দোব!

জগসিন্ধু। আরে, পছন্দ যদি না হয় তবে ডাকা কেন?

গৃহিণী। রমি মা তো বললে—না দেখলে পছন্দ হ'ল কি না হ'ল, বুঝব কেমন ক'রে?

জগসিন্ধু। আরে কি মুশকিল! ওঁদের ডাকা হয়েছিল মেয়ে পছন্দ করবার জন্যে। তোমার মেয়ে ওঁদের পছন্দ করবে সেজন্যে নয়। কি শিক্ষাই যে হচ্ছে!

গৃহিণী। আজকালকার দিনে লেখাপড়া না শিখলে মেয়ের বিয়ে হয়?

জগসিন্ধু। তোমার মেয়ের যে কোন দিন বিয়ে হবে, তা মনে হয় না। ওঁদের সঙ্গে যে রকম সব কথাবার্ত্তা চলছিল।

গৃহিণী। এ তোমার অন্যায় বাবু। ওসব কথা ওরা কলেজে শিখেছে। মাস্টারেরা কি আর কুকথা শিখিয়েছে! তারা সব পাঁচশো, সাতশো, হাজার টাকা মাইনে পায়।

জগসিন্ধু। ওই নিয়েই থাক।

গৃহিণী। তুমি আমার রমু মার ভাল দেখতে পার না। এমন গুণের মেয়ে, তার মধ্যে তুমি কোন গুণ দেখতে পাও না। পাড়ার মোটর-ড্রাইভার থেকে আরম্ভ ক'রে ছেলে বুড়ো সবাই রমিতা বলতে পাগল।

জগসিন্ধু। মোটর-ড্রাইভারদের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিও। আমি চললাম। আজ রাত্রে খাবও না, ফিরবও না।

গৃহিণী। শোন শোন, মাথা খাও।

জগসিন্ধু। মাথার কি আর কিছু বাকি আছে? সব তোমার মেয়ে খেয়ে ফেলেছে।

প্রস্থান

গৃহিণী। চলল রাগ ক'রে বোনের বাড়ি। পেছনে পেছনে—আমাকেও যেতে হবে দেখছি।

প্রস্থান

রমিতা, শমিতা ও সঙ্ঘমিত্রা ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া হাসির ভারে ভাঙিয়া পড়িল, হাসি থামিলে তিনজনে বসিল; এবারে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ লক্ষ্য করিবার অবসর; সাপের খোলসের মত স্বচ্ছ W-cut ব্লাউজের পিঠের দিকে ভিতরকার বক্ষোবাসের ফিতাটি পর্য্যন্ত দৃশ্যমান; তাদের এক হাতে একগাছি করিয়া চুড়ি, সোনার নয়; সোনার সঙ্গতি আছে বলিয়াই বোধ করি সোনার নয়—নিম্নতর কোন ধাতুর; আর এক হাতে, বাঁ হাতে বিড়ালের চোখের মত উজ্জ্বল ও ছোট কব্জি-ঘড়ি; পরনে 'ইউরেশিয়া' শাড়ি; এর চেয়ে বেশি জানিবার কৌতূহল থাকিলে একদিন দক্ষিণ পাড়ায় গিয়া দেখিয়া আসিতে হইবে; তাদের দেখা না পাইলেও ক্ষতি নাই, অধিকাংশ মেয়েই তাদের অনুকরণ করে বলিয়া যে কোন মেয়েকে দেখিলেই চলিবে

রমিতা। হাউ ফাইন!

শমিতা। হাউ কুইয়ার!

সঙ্ঘমিত্রা। ইন্‌ডীড।

রমিতা। লোকগুলো কি অক্‌ওয়ার্ড!

শমিতা। কেমন ক্লামজি দেখেছিস! যেন নিজের হাত-পাগুলো নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না।

সঙ্ঘমিত্রা। বহুকেলে পুতুলের মত নড়বড়ে; সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। একবার এদিকে একবার ওদিকে—

ভঙ্গিতে দেখাইয়া দিল যে বাঁকিয়া পড়ে

রমিতা। দু এক মিনিটের মধ্যেই কেমন জানিয়ে দিলে যে এম. এ. পাস করেছে।

এই ঘটনায় হাসিবার কি আছে জানি না, কিন্তু তারা সোচ্ছ্বাসে হাসিয়া উঠিল

শমিতা। আবার বি. এল.! বাই জোভ!

আবার উচ্চহাস্য

সঙ্ঘমিত্রা। রমি, তোর মস্ত ফাঁড়া কেটে গেল। উকিলের বউ হতে হতে বেঁচে গেলি।

শমিতা। ঘুঁটে দিতে জানিস?

রমিতা। ঘুঁটে?

শমিতা। হ্যাঁ রে হ্যাঁ, ঘুঁটে। উকিলের বউ হ'লে ঘুঁটে দিতে হয়।

রমিতা। কি বলিস!

শমিতা। জানিস না? তবে শোন—আলিপুরের উকিলেরা যখন কোর্টে যায়—তখন বিরহিণী উকিলানীরা গোময় মর্দ্দন ক'রে দেয়ালে গোময়-চন্দ্রিকা দেয়। বিরহের ওটা ধন্বন্তরি ওষুধ।

সঙ্ঘমিত্রা। শুনলি কোথায়?

শমিতা। আমার ফ্রেণ্ড মিঃ দত্ত বলছিল। কোন্ পুরাণে নাকি সে পড়েছে যে, পবিত্র গোময়ের স্পর্শে পাপচিন্তা মনে প্রবেশ করতে পারে না।

সকলের উচ্চহাস্য

শমিতা। সেকালে রাজারা যখন মৃগয়ায় যেতেন, শুদ্ধান্তঃপুরের শত শত রাজ্ঞী তখন কি করতেন জানিস? গোষ্ঠগৃহ থেকে গোময় সংগ্রহ ক'রে এনে দেয়ালে ঘুঁটে দিতেন। তারপরে রাজা ফিরে এসে প্রত্যেকের ঘুঁটে গুনে কার কত পাতিব্রত্য বুঝতে পারতেন।

সঙ্ঘমিত্রা। ইস! রমি, কি সুযোগটাই তোর না ফস্কে গেল! দুপুরে ঘুঁটে দিতিস, বিকেলে বর এসে ঘুঁটে গুনে তোর ভালবাসার পরিমাণ বুঝে নিত।

রমিতা। সংখ্যায় এদিক ওদিক ক'রে দিতাম।

সঙ্ঘমিত্রা। বলিস কি রে? সংখ্যা এদিক ওদিক করা কি সহজ কাজ! এই যে এত বড় সেন্সাসটা হয়ে গেল, তাতে কি সংখ্যায় কম বেশি করা সম্ভব হয়েছে?

রমিতা। শুনছি যে এবারে লোকসংখ্যা খুব বেড়ে গিয়েছে।

সঙ্ঘমিত্রা। প্রত্যেক সম্প্রদায় এবারে ঠিক ঠিক সংখ্যা বলছে কিনা। সবাই ঠিক ঠিক বললে মোটের ওপরে একটু বেঠিক হবেই।

রমিতা। সত্যি বলছি ভাই, বাবার ওপরে আমার বড্ড রাগ ধরছে। কোত্থেকে এক অজ কুজ ধ'রে নিয়ে এসে, বলেন কিনা, বিয়ে কর!

শমিতা। আবার সঙ্গে দুই উত্তরসাধক, যেমন চেহারা, তেমনই পোশাক, তেমনই আদবকায়দা।

সঙ্ঘমিত্রা। আদৌ কাল্‌চার নেই।

শমিতা। কাল্‌চার সবার থাকে না, সবাই তো আর দক্ষিণ পাড়ার লোক নয়। কিন্তু কৃষ্টি থাকতেও তো পারত।

রমিতা। কৃষ্টি না থাক, সংস্কৃতি।

সঙ্ঘমিত্রা। অন্তত চর্য্যা কিম্বা মনঃপ্রকর্ষ।

শমিতা। কিম্বা বড়ুয়া শার্ট।

রমিতা। কিম্বা গ্রীসীয়ান স্লিপার।

সঙ্ঘমিত্রা। কিম্বা কাবুলী কাছা।

তিনজন সমস্বরে। হাউ ফানি, হাউ সিলি! মাই গড!

রমিতা। বাবা আসুন, আমি বলব—এত যে লেখাপড়া শিখলাম, সে কি শুধু বিয়ে করবার জন্যে?

শমিতা। এ বিষয়ে তোর মা খুব সেন্সিব্‌ল।

শমিতা। তা বটে। উনি যদি আর কুড়ি বছর পরে জন্মাতেন, খুব আপ-টু-ডেট হতেন।

রমিতা। এত লেখাপড়া—শেলি, কীট্‌স, স্পেণ্ডার, অডেন, এলিয়ট, প্রুস্ত, ফ্রয়েড, লরেন্স সব গিয়ে শেষ হবে পাতিব্রত্যের বাসরঘরে!

শমিতা। জাস্ট ইম্যাজিন, রমিতা রয় ঘোমটা টেনে আলু-পটলের হিসেব করছে।

সঙ্ঘমিত্রা। হাউ হরিব্‌ল!

রমিতা। বিয়ে করব না কেন, নিশ্চয় করব। কিন্তু তার আগে কিছুকাল স্বাধীন গতি চাই।

সঙ্ঘমিত্রা। সার্টেন্‌লি। প্রেমের পালা শেষ হয়ে গেলে তারপরে ধীরে সুস্থে র'য়ে ব'সে বিয়ে করা যাবে।

শমিতা। আমাদের হিন্দু-বিবাহে প্রেমের স্থান নেই।

সঙ্ঘমিত্রা। এদেশে পত্নীরা হচ্ছে স্বামীর দাসী। দেখ না, সীতা রামের সঙ্গে বনে চলল! কি দরকার ছিল অত বাড়াবাড়িতে?

রমিতা। একা থাকলে হয়তো বিপথে মন যেত।

শমিতা। অযোধ্যায় কি গরু ছিল না? ব'সে ব'সে ঘুঁটে দিলেই হ'ত। আচ্ছা ভাই, তোর কি রকম 'লাভার' পছন্দ?

রমিতা। বলব? আমি চাই রোমিও-র মত হিরো। যৌবনে দুর্মদ, সাহসে দুরন্ত, আবেগে উন্মাদ—একেবারে প্রাণের দাবানল, মালা ব'লে যে শৃঙ্খল গলায় দেয়, শৃঙ্খল যে ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলে দিতে পারে মালার মত; প্রেয়সীকে যে আলিঙ্গন করে অসির মত আর অসিলতাকে প্রেয়সী ব'লে সবলে বাহুপাশে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে ফেলে দেয়; বাসন্তিক উন্মাদনায় হলাহল পানে যার হাসি, আর অমৃতের পাত্রের স্বাদে যার বিক্ষোভ—আমি চাই সেই রোমিওকে, কিন্তু থাকা চাই তার থাইসিস।

শমিতা। থাইসিস কেন?

রমিতা। নইলে প্রেমে আনন্দ কই? ঢিমে তালের দীর্ঘ লয়ের জীবনে প্রেম সম্ভব নয়। দাও সমস্ত জীবনীশক্তিকে এক মুহূর্ত্তের চরম দাবানলে জালিয়ে—জ্বলুক আগুন, পুড়ুক ইন্ধন, মরুক পতঙ্গ, তবে তো প্রেম। থাইসিসের মরণমুখী রক্তিমাভা আমার সেই জীবন-যজ্ঞের হুতাশন।

সঙ্ঘমিত্রা। ব্র্যাভো!

শমিতা। আর তোর পছন্দ কি শুনি?

সঙ্ঘমিত্রা। আমার প্রেমিক হবে হ্যাম্‌লেটের মত। প্রেমে আর পাগলামিতে যার ভেদ নেই; মড়ার মাথার খুলি নিয়ে যার জীবনের কথা মনে পড়ে আর আস্ত মানুষটাকে যে ইঁদুরের মত মেরে পা ধ'রে টেনে ফেলে দেয়; ওফেলিয়াকে নির্ম্মম আঘাত ক'রে ফিরেও চায় না, আর তার ভাইয়ের কাছে বিনা দোষে বারম্বার চায় ক্ষমা; বাসরঘরে যেতে যার একান্ত শঙ্কা, আর মৃত্যুর মধ্যে এগিয়ে যায় যে অকুতোভয়ে—আমি চাই সেই হ্যাম্‌লেটকে, কিন্তু সে হবে ভাই একদম গরিব।

শমিতা। গরিব কেন?

সঙ্ঘমিত্রা। নইলে প্রেমে উন্মাদনা কই? একবস্ত্রে দুইজনে নল-দময়ন্তীর মত চির-সংপৃক্ত হয়ে থাকব; ছেঁড়া কাঁথায় পাশাপাশি শুয়ে লক্ষ টাকার নন্দনবনের দেখব স্বপ্ন। জীবনে কি সুখ আছে? সুখ হচ্ছে সুদূরে—দারিদ্র্য হচ্ছে জীবন-কারাগারের ফাটল; তার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়বে—গিরিদরী কানন-কান্তার আর বিরহের হলাহল-পানে নীলকণ্ঠ সুদূর।

শমিতা। বাঃ বাঃ!

রমিতা। এবার তোর পছন্দ কি শুনি?

শমিতা। আমি ভাই, তোদের তুলনায় সেকেলে—আমার আইডিয়াল দুষ্মন্ত।

দুইজনে। দুষ্মন্ত!

শমিতা। দুষ্মন্ত। হঠাৎ একদিন মত্ত হস্তীর মত এসে পড়বে আমার ছায়াঘেরা বনে—তার প্রতি পদক্ষেপে আমার এতদিনের সাধের পুষ্পতরু সব পড়বে ভেঙে ভেঙে—ঝরবে ফুল, মরবে মূল, উড়বে ভ্রমর, ছুটবে হরিণ প্রাণের ভয়ে। ভ্রমরের হাত থেকে যে মুখ-পদ্মকে রক্ষা ক'রে করবে ভ্রমরাধিক দংশন; হরিণের প্রতি দয়া ক'রে যে শর-সম্বরণ ক'রে সেই শর করবে নিক্ষেপ অবলার হৃদয়ে, আমি চাই সেই দুষ্মন্তকে, সাম্রাজ্যেশ্বর হয়েও যে আমার পায়ে পড়বে লুটে, কিন্তু ভাই, তার থাকা চাই অন্তত একশো এক পত্নী।

রমিতা। কি সর্ব্বনাশ!

সঙ্ঘমিত্রা। কেন?

শমিতা। নইলে অবসর পাব কেমন ক'রে? তোরা প্রেমে চাস উন্মাদনা, আমি চাই স্বস্তি। অষ্টপ্রহরব্যাপী প্রেম কি বরদাস্ত

হয়? মাঝে মাঝে দুষ্মন্তকে লেলিয়ে দিতাম ওই একশো এক সপত্নীর দিকে—সেই অবসরে নিতাম প্রাণ ভ'রে ঘুমিয়ে, কি সখীর সঙ্গে গল্পগুজব ক'রে।

রমিতা। ধন্যি তোর সাহস!

এমন সময় খট খট করিয়া কড়া বাজিয়া উঠিল

শমিতা। নে, ওই এল তোদের রোমিও আর হ্যাম্‌লেট।

সঙ্ঘমিত্রা। দুঃখ নেই, তোর দুষ্মন্তও বাদ পড়বে না।

রমিতা। কাম ইন।

হেমন্ত, মধু ও হরিশের প্রবেশ; ইহারা আর কেহ নয় জগৎ, সেন ও চৌধুরীর মোটর-ড্রাইভার; কিন্তু এখন আর তাদের মোটর-ড্রাইভার বলিয়া চিনিবার উপায় নাই; তিনজনের দেহেই চলনসই ষ্টাইলের ইউরোপীয় পোশাক, বয়সে তিনজনেই যুবক; তাদের একজনের হাতে ছোট একটি অ্যাটাচি কেস; আর একজনের হাতে শিকলে বাঁধা একটি কুকুর; ইহারা ছদ্মনামে পরিচয় দান করিবে, চলনসই রকম ইংরেজী বুলি বলিতে পারে, ভাষাজ্ঞানের অভাব কৌশলে ও বলিবার ভঙ্গিতে পুরণ করিয়া লয়

রমিতা। কাকে চান?

হেমন্ত। মিস রমিতা রয়।

রমিতা। হ্যাঁ, আমি।

হেমন্ত। ও, আই সী! গুড মর্নিং।

বিকালবেলায় গুড মর্নিং শুনিয়া তিনজনে চমকিয়া উঠিল; হেমন্ত ইংরেজী কায়দায় 'বাউ' করিল

হেমন্ত। লেট মি হ্যাভ দি প্লেজার অব ইন্‌ট্রোডিউসিং মাই ফ্রেণ্ড্‌স—মিঃ সারকার (মধুকে) অ্যাণ্ড মিঃ ডস (হরিশকে), মাইসেল্‌ফ ইওর সার্ভেণ্ট ডক্টর খাসনবীশ।

মধু ও হরিশ গুড মর্নিং বলিল

রমিতা। আমার পরিচয় কোথায় পেলেন?

হেমন্ত। হাঃ হাঃ হাঃ। যেখানে সেখানে যত্র তত্র। পথে ঘাটে কেবলি শুনছি—মিস রমিটা রয়।

রমিতা। আমার নাম যখন শুনেছেন, তখন অবিশ্যি এদের নামও শুনেছেন। মিস শমিতা সরকার, মিস সঙ্ঘমিত্রা বোস—আমার বন্ধু।

হেমন্ত। বাই জোভ। মাপ করবেন, চিনতে পারি নি। পারা উচিত ছিল। খুব শুনেছি, একসঙ্গে তিনটে নামই তো বটে।

মেয়েরা নমস্কার করিল, পুরুষেরা গুড মর্নিং জানাইল

রমিতা। যদি কিছু মনে না করেন, তবে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এমন বিকেলবেলায় আপনারা গুড মর্নিং জানাচ্ছেন, এটা কেমন?

হেমন্ত। ওটা আমেরিকান ঘড়ির সময় অনুসারে।

রমিতা। আমেরিকান ঘড়ি? সে আবার কি?

হেমন্ত। আমরা এইমাত্র আমেরিকা থেকে আসছি কিনা।

রমিতা। আপনারা আমেরিকা থেকে আসছেন? বসুন, বসুন।

মেয়েরা ব্যস্ত হইয়া উঠিল

হেমন্ত। নেভার মাইণ্ড।

তিনজনে বসিল

রমিতা। কবে রওনা হয়েছিলেন?

হেমন্ত। আজ সকালে। তখন কটা হবে সরকার?

মধু। প্রায় চারটে।

হরিশ। আমাদের ভোর মানে ওদের সন্ধ্যা।

সঙ্ঘমিত্রা। এর মধ্যে পৌঁছলেন কি ক'রে?

হেমন্ত। আপনারাও জানেন না? মাই গড! আমরা ভেবেছিলাম,

আর কেউ না জানুক, দক্ষিণ পাড়ার মেয়েরা নিশ্চয় জানবেন, মিস রমিটা রয় নিশ্চয় জানবেন।

মধু। আমাদের দেশের মধ্যে আপনারাই সবচেয়ে এগিয়ে আছেন, অথচ ওদেশের তুলনায় কত পিছিয়ে!

হরিশ। হবে হবে, ক্রমে হবে। আঃ, আপনারা যদি কেবল একবার আমেরিকা যেতে পেতেন!

হেমন্ত। আগে কাজের কথা সেরে নিই। বুঝলেন মিসেস—

মিসেস শুনিয়া মেয়েরা চমকিয়া উঠিল

হেমন্ত। মিসের বহুবচনে, মিসেস—ওদেশের এখন এইটেই আধুনিকতম রীতি।

সঙ্ঘমিত্রা। আপনি ভাবছেন, আমরা এই অত্যন্ত সাধারণ কথাটা জানি না?

মধু। কি আশ্চর্য্য, আপনাদের অজানা কিছু কি থাকতে পারে?

রমিতা। তারপরে বলুন।

হেমন্ত। আমরা তিনজনে তিনটে বেলুনে চ'ড়ে খুব উঁচুতে উঠে স্থির হয়ে থাকলাম—

মধু। নীচে তাকিয়ে দেখি, মিসিসিপি নদী নীল ফিতেটার মত দেখা যাচ্ছে—

হরিশ। আর হোয়াইট হাউসের ছাতে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে দেখা যাচ্ছে—ঠিক যেন একটা এক পয়সার শিঙাড়া।

হেমন্ত। একজ্যাক্টলি। তারপরে যখন দিনরাত্রির সন্ধিক্ষণে পৃথিবী পাক খেয়েছে, অমনই আমরা তিনজনে তিনটে প্যারাশুট নিয়ে দিলাম লাফ—একেবারে পড় তো পড় কলকাতা শহরের গড়ের

মাঠে। কেবল মিঃ সরকার উলুবেড়ের এক বাঁশঝাড়ে বেধে গিয়েছিল।

রমিতা। কি আশ্চর্য্য!

হেমন্ত। আশ্চর্য্য বইকি। কিন্তু এখনও সব হয় নি। পুলিসের লোক আমাদের জার্মান প্যারাশুট-বাহিনীর লোক মনে ক'রে গুলি করে আর কি। অবশেষে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের চিঠি দেখিয়ে রক্ষা পাই।

রমিতা। এমন ভাবে যে আমেরিকা থেকে আসা যায়, তা জানতাম না তো।

হেমন্ত। ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক। পৃথিবী ঘুরছে তা তো জানেন—এ পিঠে ভারতবর্ষ, ও পিঠে আমেরিকা, ঠিক দিবারাত্রির সন্ধিক্ষণে ওপর থেকে লাফ দিলেই—বাস্।

সঙ্ঘমিত্রা। ঠিক ঠিক, এখন আমার মনে পড়েছে—কোথায় যেন পড়েছি।

হেমন্ত। পড়বেনই তো—আপনারা যে দক্ষিণ পাড়ার মেয়ে।

রমিতা। আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে বড় সুখী হলাম। তা কি মনে ক'রে আগমন?

হেমন্ত। অনেক দিন আমেরিকায় কাটিয়ে দেশে ফিরে এসে দেখি, দেশটা পিছিয়ে গেছে।

মধু। তার চেয়ে বল, আমরা এগিয়ে গেছি।

হেমন্ত। কারও কথা বুঝতে পারি না, কেউ আমাদের কথা বোঝে না।

মধু। সেই যাবার আগে শুনেছিলাম—সবাই বলছে কালচার, আজ ফিরে এসে শুনি—সেই কালচারই চলছে।

রমিতা। না মিঃ খাসনবীশ, কেউ কেউ এখন কৃষ্টি বলতে সুরু করেছে।

হেমন্ত। করেছে নাকি? গ্র্যাণ্ড! তা হ'লে দেশের বিষয়ে একেবারে হতাশ হবার কারণ নেই।

সঙ্ঘমিত্রা। অনেকে আবার সংস্কৃতি বলে।

মধু। বলে নাকি? মাই গড! ডক্টর খাসনবীশ, আমাদের দেশও তা হ'লে এগোচ্ছে।

হেমন্ত। এগোবে বইকি। স্লো রেসে ফার্স্ট হবে।

হরিশ। আমার ভাই, অত ভরসা নেই। যাবার সময়ে দেখে গিয়েছিলাম—সবাই বলছে প্রোগ্রেস, ফিরে এসেও তাই শুনছি।

শমিতা। নিশ্চয় তা হ'লে উত্তর পাড়ায় শুনেছেন। এদিকে সবাই বলে—প্রগতি।

হেমন্ত। প্রগতি! ওয়াণ্ডারফুল! শব্দটা এত চমৎকার যে ওতেই মন খুশি হয়ে ওঠে, আর না এগোলেও চলে।

মধু। আগে সবাই বলত ফ্রেণ্ড্স, এখন—

শমিতা। এখন আর ফ্রেণ্ড্স নয়, কম্‌রেড।

হেমন্ত। কম্‌রেড! সুপার্ব! ওহে সরকার, দিনে দিনে দেশের হ'ল কি?

মধু। তাই তো, এ যে ক্রমে আমেরিকা হয়ে উঠল!

হরিশ। মনে আছে খাসনবীশ, আগে দেখেছি, সবাই ব্যাধির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে করছে মৃত্যু-নিয়ন্ত্রণ।

সঙ্ঘমিত্রা। ওসব পুরোনো ধারা একবারে বদলে গেছে, এখন আমাদের দেশে চলছে জন্মনিয়ন্ত্রণের পালা।

হেমন্ত। এক্সেলেণ্ট! তবে আর ভয় নেই। না হে, দেশের বিষয়ে একেবারে নিরাশ হ'য়ো না।

হরিশ। ঠিক, এবারে আমেরিকায় ফিরে গিয়ে সগর্ব্বে মাথা উচু ক'রে বেড়াব।

রমিতা। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—আমেরিকায় আপনারা কি করতেন?

হেমন্ত। নিজের মুখে নিজের কথা কি ক'রে বলব?

মধু। কেন, আপনারা আমেরিকান কাগজে পড়েন নি?

হরিশ। নিশ্চয় পড়েছেন। দক্ষিণ পাড়ার মেয়েরা বিদেশী কাগজ পড়ে না—এ তুমি বিশ্বাস করতে বল?

হেমন্ত। দাশ হচ্ছেন বড় একজন আর্টিস্ট, আমেরিকায় হাজার হাজার ডলার তিনি প্রতিদিন রোজগার করেন।

মধু। মিঃ ফোর্ডের একখানা ছবি আঁকার জন্যে তিনি পেয়েছিলেন এক লক্ষ ডলার।

রমিতা। এক লক্ষ ডলার!

সঙ্ঘমিত্রা। তার মানে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা।

হেমন্ত। ওদেশে আবার খরচও তেমনই। একটা সিগারেটের দাম বাইশ ডলার। আর সরকার হচ্ছেন বড় স্কাল্‌প্‌টার, ওঁরও উপার্জ্জন হাজার হাজার ডলার—প্রতিদিন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মূর্ত্তি গ'ড়ে পেয়েছিলেন দেড় লক্ষ ডলার।

রমিতা। মাই গড!

শমিতা। আর আপনি?

হেমন্ত। আমি চ্যাম্পিয়ান থ্রোয়ার।

সঙ্ঘমিত্রা। কি থ্রো করেন?

শমিতা। জ্যাভেলিন ?

রমিতা। বল ?

হেমন্ত। ওসব কিছুই না। কিস—আমি চ্যাম্পিয়ান কিস-থ্রোয়ার।

শমিতা। কি সর্ব্বনাশ !

হেমন্ত। সর্ব্বনাশ কিসের ?

রমিতা। কতদূর আপনি থ্রো করতে পারেন একটা কিস ?

হেমন্ত। এই সেদিন আমি নিউ ইয়র্কের সাড়ে তিন শো তলা অট্টালিকার ওপরে ব'সে ছিলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম, হলিউডের বাড়ির বারান্দায় গ্রেটা গার্বো রৌদ্র-স্নান করছে। দিলুম এক কিস থ্রো ক'রে। অতদূর পৌছবে ভাবি নি, কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পেলাম গ্রেটা ডিয়ারি চট ক'রে বাঁ হাত দিয়ে ধ'রে নিলে। নিউ ইয়র্ক থেকে হলিউড হাজার দুই মাইল হবে।

সঙ্ঘমিত্রা। হবে বইকি। আমি পড়েছি।

মধু। পড়বেনই তো, আপনাদের ঠকাতে পারি এমন বিদ্যে আমাদের নেই।

হেমন্ত। আচ্ছা, এদেশে একটা কিস থ্রো করলে কত দূর যায় ?

রমিতা। মিঃ থাসনবীশ, এদেশের কথা আর বলেন কেন ? লুকিয়ে চুরিয়ে বেলা পৌনে দুটোর সময় যদি একটা কিস থ্রো করেন—যাবে বড় জোর ওই পাশের বাড়ির জানলা অবধি।

হেমন্ত। এত কম ?

রমিতা। উত্তর পাড়াতে অত দূরও যায় না। দক্ষিণ পাড়ার রেকর্ডই হচ্ছে ইণ্ডিয়ার রেকর্ড।

মধু। নাঃ, এ বিষয়ে এখনও দেশ পিছিয়ে আছে।

হরিশ। তবু আপনারা যা হোক মুখ রক্ষা করেছেন।

রমিতা। তবু ভাল যে আপনারা অ্যাপ্রিশিয়েট করলেন।

শমিতা। ডক্টর থাসনবীশ, ওই কেসটাতে কি আছে ?

হেমন্ত। ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। ও ভারী এক মজার জিনিস।

শমিতা। আপত্তি না থাকলে একবার দেখান না।

হেমন্ত। আপত্তি ? আপনাদের দেখাব ব'লেই তো এনেছি। সার্কাসে বলের খেলা দেখেছেন নিশ্চয়, ওই যে একসঙ্গে হাতে অনেকগুলো বল নিয়ে লুফতে থাকে।

সঙ্ঘমিত্রা। খুব দেখেছি।

হেমন্ত। এই বাক্সে সেই খেলার কতকগুলো বল আছে। আচ্ছা, কটা বল একসঙ্গে লুফতে দেখেছেন ?

সঙ্ঘমিত্রা। আট দশটা হবে।

হেমন্ত। তবে আর কি দেখেছেন! আমেরিকার সবচেয়ে বড় যাদুকরের কাছে আমার শিক্ষা—একসঙ্গে সাতাশটা বল লুফতে পারি।

রমিতা। ওয়াণ্ডারফুল! দয়া ক'রে একবার দেখান।

হেমন্ত। বলগুলো বের করবার আগে একটু সতর্ক ক'রে দিই। এ বলগুলোর বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, এগুলোর কোন রং নেই।

মধু। থাসনবীশ, রং নেই না ব'লে বল যে, ওগুলোর রং হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের রং।

হেমন্ত। ওই একই কথা হ'ল। আর সেইজন্যেই চট ক'রে চোখে পড়তে চায় না। হঠাৎ মনে হতে পারে, বলগুলো আদৌ নেই ; কিন্তু চোখ একটু অভ্যস্ত হ'লেই দেখতে পাবেন।

হরিশ। তুমি সে ভয় ক'র না—এঁদের চোখ দক্ষিণ পাড়ার চোখ।

হেমন্ত। আচ্ছা, এইবারে দেখুন।

এই বলিয়া সে বাক্স খুলিল, বলা বাহুল্য বাক্সর মধ্যে কিছুই নাই, সব ফাঁকা। কিন্তু সে যেন একটি একটি করিয়া বল টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিতেছে, এমন ভান করিল। এই বল-সম্বন্ধীয় যাবতীয় খেলাতে কোথাও বল দেখা যাইবে না, কারণ নাই; কিন্তু সকলেই এমনভাবে ব্যবহার করিবে, যেন সত্যিই বলগুলি আছে

হেমন্ত। এই দেখুন, পাশাপাশি সাতাশটা বল সাজিয়ে রেখেছি।

মধু। ঠিক দেখতে পাচ্ছেন?

হরিশ। প্রথমে একটু অসুবিধে হবে, আমাদেরও হয়েছিল।

মধু। খাসনবীশ, ওই বাঁ ধারের বলটা কেমন যেন তুবড়ে গিয়েছে।

হেমন্ত। সবগুলোর যে যায় নি সেই ভাগ্যি। প্যারাশুট থেকে মাটিতে পড়বার সময়ে বাক্সটাতে চোট লেগেছিল।

রমিতা। কি আশ্চর্য্য, বলগুলোর রং কেমন কৌশলে অ্যাটমস্ফিয়ারের সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি করা হয়েছে!

শমিতা। ঠিক মনে হচ্ছে যেন নেই।

সঙ্ঘমিত্রা। ও কিছু নয়, চোখ অভ্যস্ত হ'লেই দেখতে পাওয়া যাবে—আপনি খেলা আরম্ভ করুন।

হেমন্ত। ঠিক বলেছেন। এই নিন, আরম্ভ করলাম।

এই বলিয়া সে বল লইয়া লুফিবার অভিনয় আরম্ভ করিল

এই দেখুন প্রথমে চারটে নিলুম। এই দেখুন, আর দুটো—এই যে আরও দুটো। হ'ল আটটা—এই নিন আরও চারটে—বারোটা। এবারে একসঙ্গে নিলুম আটটা—কুড়িটা।

মধু। ওয়াণ্ডারফুল!

হরিশ। এক্সেলেণ্ট!

মধু। খাসনবীশ, এমন খেলা তুমি শিকাগোতেও দেখাতে পার নি।

হরিশ। এই যা, একটা প'ড়ে গেল।

হেমন্ত। নেভার মাইণ্ড। এই যে আরও চারটে নিলুম।

মধু। দেখতে পাচ্ছেন মিস রয়?

হরিশ। প্রথমে না পেলেও দুঃখ করবার কিছু নেই। আমরা যখন হলিউডে খেলা দেখাতে যাই, প্রথমে স্বয়ং গ্রেটা গার্বো বল দেখতে পায় নি—পুরুষের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ অদেখা যার নেই, সেই গ্রেটাই প্রথমে দেখতে পায় নি।

মধু। তখন কি বলেছিলাম মনে আছে?—গ্রেটা ডিয়ারি, তুমি না দেখতে পেলেও আমাদের ইণ্ডিয়ার দক্ষিণ পাড়ার মেয়েরা ঠিক দেখতে পাবে।

হরিশ। এখন আপনারাও যদি দেখতে না পান, তবে কিন্তু হলিউডের কাছে নিশ্চিত পরাজয়।

রমিতা। আমার চোখ ভাই, এরই মধ্যে অভ্যস্ত হয়েছে—একটু একটু দেখতে পাচ্ছি।

সঙ্ঘমিত্রা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও দেখতে পাচ্ছি।

শমিতা। আমিও যেন দেখতে পাচ্ছি।

রমিতা। শমিতা, কটা বল গুনতে পারিস?

শমিতা। মনে হচ্ছে বাইশটা।

সঙ্ঘমিত্রা। উঁহু, চব্বিশটা।

রমিতা। না ভাই, আমার মনে হচ্ছে পঁচিশটা; কারণ ওই দেখ না, টেবিলের ওপরে মাত্র দুটো বল আর প'ড়ে রয়েছে।

হেমন্ত। এক্জ্যাক্টলি, ঠিক ধরেছেন। এই নিন ও দুটোও তুলে নিলুম, এবারে এই দেখুন, সাতাশটা একসঙ্গে লুফছি।

রমিতা। সুপার্ব! এমন খেলা আগে দেখি নি।

সঙ্ঘমিত্রা। এমন বলের কথাই কি আগে শুনেছি?

শমিতা। যেমন বল, তেমনই খেলা, তেমনই খেলোয়াড়েরা।

মধু। আর আপনারাই বা কম কি?

হরিশ। আমি জোর ক'রে বলতে পারি, ইণ্ডিয়াতে এই বল আপনারা ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় এমন সাধ্য নেই।

হেমন্ত। ওঃ, বড্ড ক্লান্ত হয়েছি।

মধু। এবারে বন্ধ কর।

হেমন্ত। হ্যাঁ, আর পারি না।

সে খেলা বন্ধ ও বলগুলি বাক্সের ভিতরে তুলিয়া রাখিবার অভিনয় করিল

রমিতা। ডক্টর খাসনবীশ, আপনার এই কুকুরটা খুব সুন্দর।

হেমন্ত। হবেই তো, আমেরিকা থেকে আনা কিনা।

মধু। খাসনবীশ, তোমার কুকুরটার খেলা একবার দেখিয়ে দাও না কেন?

হেমন্ত। মন্দ বল নি। জানেন মিস রয়, মেক্সিকোর এক রেড ইণ্ডিয়ান এই কুকুরটা আমাকে দিয়েছিল। এর একটা আশ্চর্য্য শক্তি আছে।

রমিতা। কি শক্তি?

হেমন্ত। ওর কথা মানুষে বুঝতে পারে।

রমিতা। আমরা পারব?

হেমন্ত। ক্রমে পারবেন, প্রথমে হয়তো পারবেন না।

মধু। যেমন প্রথমে বলগুলো দেখতে পান নি, ক্রমে পেলেন।

সঙ্ঘমিত্রা। কুকুরের খেলা একবার দেখান না।

শমিতা। ওদেশে দেখি কিছুই অসম্ভব নয়।

হরিশ। মোটেই নয়।

হেমন্ত। কুকুরটার নাম হচ্ছে—মণ্ট জুমা। আমি ডাকি ওকে জুমা ব'লে। এই জুমা! জুমা!

এই বলিয়া সে কুকুরকে এক খোঁচা দিল, কুকুর কেঁউ কেঁউ করিয়া উঠিল
হেমন্ত প্রভৃতি তিনজনে হাসিয়া উঠিল

রমিতা। হাসলেন কেন?

হেমন্ত। এমন মজার কথাতে না হেসে পারা যায়?

মধু। ধন্যি কুকুর!

হরিশ। যেমন দেশ, তেমনই কুকুর হবে তো!

রমিতা। বলুন না, ও কি বললে?

হেমন্ত। ও বললে যে, মিসিবাবাদের বলুন, ওঁদের বিয়ের সময় আমাকে যেন ক্যাস্টর অয়েল দিয়ে লুচি ভেজে দেন। ঘিয়ে ভাজা লুচি খেলে আমার লোম প'ড়ে যাবে।

রমিতা। আশ্চর্য্য!

সঙ্ঘমিত্রা। আপনারা বুঝতে পারলেন?

হেমন্ত। পারব না? দক্ষিণ পাড়ার ভাষা বুঝতে পারি, আর কুকুরের ভাষা বুঝতে পারব না?

রমিতা। আর একবার ওকে দিয়ে কিছু বলান না।

হেমন্ত কুকুরকে খোঁচা মারিল, কুকুর ডাকিয়া উঠিল

হেমন্ত। কি সর্ব্বনাশ!

মধু। কুকুরটা এতও জানে!

রমিতা। কি বললে?

হেমন্ত। বললে, মিসিবাবারা এক হাতে চুড়ি প'রে খরচ বাঁচিয়েছেন—সেই টাকা দিয়ে আমাকে একটা সোনার বকলস বানিয়ে দিন।

রমিতা। কি আশ্চর্য্য! কুকুরটা শুধু যে ভাষা জানে তা নয়, কেমন সূক্ষ্ম বুদ্ধি!

সঙ্ঘমিত্রা। আর ইকনমিক্সের কেমন জ্ঞান!

শমিতা। বাস্তবিক, অনেক মানুষের চেয়ে ওর কাণ্ডজ্ঞান বেশি।

আবার কুকুরকে খোঁচা মারিতে কুকুর ডাকিয়া উঠিল

হেমন্ত। এবারে কি বললে জানেন? বললে, মিছিমিছি কথা বলব কেন? মিসিবাবারা কিছু খেতে দিক।

শমিতা। বাস্তবিক ভাই, ওকে কিছু খেতে দাও।

রমিতা খান দুই বিস্কুট আনিয়া কুকুরকে খাইতে দিল—আশ্চর্য্য কুকুরটা খাইতে লাগিল

রমিতা। আশ্চর্য্য! দেখুন, দেখুন, কুকুরটা খাচ্ছে!

মধু। তাই তো। ওয়াণ্ডারফুল!

হেমন্ত। আপনারা কুকুরের ভাষার কিছু বুঝলেন?

রমিতা। এ আপনার বল দেখবার চেয়েও কঠিন।

শমিতা। মানুষের ভাষার চেয়েও জন্তুর ভাষা দুরূহ।

মধু। তার মধ্যে আবার কুকুরের ভাষা সবচেয়ে শক্ত।

শমিতা। কেন?

মধু। কুকুর মানুষ-ঘেঁষা জানোয়ার কিনা, তাই কুকুরের ভাষার ওপরে মানুষের ভাষার প্রভাব আছে, আর মিশ্র ভাষা হ'লেই কঠিন হ'বে।

হরিশ। আবার মানুষের ভাষার ওপরেও কুকুরের ভাষার প্রভাব আছে।

সঙ্ঘমিত্রা। কিন্তু আমি যেন ওর শেষের দিকের দু একটা কথা বুঝতে পেরেছি।

রমিতা। তার কারণ তোর ফোনেটিভ আর কম্পারেটিভ ফিললজি খানিকটা জানা আছে।

সঙ্ঘমিত্রা। তা হ'তে পারে।

হেমন্ত। আমি ভাই, এবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তোমাদের বিদ্যা তোমরা কিছু দেখাও। মিস রমিটা রায়, মিঃ দাশ হচ্ছেন গিয়ে বড় আর্টিস্ট, আর মিঃ সরকার বড় ভাস্কর।

শমিতা। মিঃ দাশ, চট ক'রে আমায় একটা ছবি এঁকে দিন না।

হরিশ। বিপদে ফেললেন দেখছি।

সঙ্ঘমিত্রা। মিঃ সরকার, আপনি আমায় একটা মূর্ত্তি গ'ড়ে দিন না।

মধু। কি বিপদেই ফেললেন! আচ্ছা, চলুন একটা নিরিবিলি জায়গাতে। খানিকটা মাটি চাই।

সঙ্ঘমিত্রা। চলুন, পাশের ঘরটাতে যাওয়া যাক।

দুইজনের প্রস্থান

শমিতা। মিঃ দাশ, চলুন, আমরা ওই ঘরটাতে যাই।

হরিশ। চলুন, কাগজ পেন্সিল আছে তো?

দুইজনের প্রস্থান

রমিতা। ডক্টর খাসনবীশ, এবারে একটু নিরিবিলি পাওয়া গেছে, আপনাকে দু একটা কাজের কথা জিজ্ঞাসা ক'রে নিই।

হেমন্ত। করুন না। হলিউডের মেয়েরাও সময় নষ্ট হতে দেয় না। ডিনার, পার্টি, ক্লাব, ডান্স, টয়লেট, শুটিং, ফ্লার্টিং ক'রেও যদি হাতে সময় থাকে, তারা তা বৃথা নষ্ট করে না। তখন তারা ইনকা আর হিটাইট সভ্যতার বিষয়ে আলোচনা করে। আপনার কথা শুনে হলিউডের মেয়েদের কথা মনে পড়ল।

রমিতা। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, আমরা দক্ষিণ পাড়ার মেয়েরা কি ইতিমধ্যেই সমাজের ওপরে কৃষ্টির একটা ছাপ দিই নি?

হেমন্ত। শুধু সমাজের ওপরে কেন? হতভাগ্য যুবকদের হৃদয়ের ওপরেও ছাপ পড়েছে।

রমিতা। তা জানি। আপনারা আসবার কিছুক্ষণ আগে উত্তর পাড়ার এক যুবক দুই বন্ধুকে নিয়ে আমার সঙ্গে বিয়ের কথা বলতে এসেছিল। আচ্ছা, এ রকম ক্ষেত্রে হলিউডের মেয়েরা কি করত?

হেমন্ত। বিয়ে? হেসে উড়িয়ে দিত মিস রয়, হেসে উড়িয়ে দিত। অবশ্য স্লার্টিং হ'লে স্বতন্ত্র কথা।

রমিতা। আমিও ঠিক তাই করেছি।

হেমন্ত। সত্যি? মিস রয়, আপনার গৌরবে আমিও গৌরব অনুভব করছি। সত্যি বলছেন, ফিরিয়ে দিয়েছেন? হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন? ব্র্যাভো! বিয়ে? অ্যাব্‌সার্ড। বিয়ে তো সেই যুগের অনুষ্ঠান, যখন বিজ্ঞানের এমন উন্নতি হয় নি।

রমিতা। তা হ'লে আপনি বলছেন, আমি ঠিক করেছি?

হেমন্ত। ঠিক ব'লে ঠিক। একশো বার ঠিক। যেমন দেখছি, হলিউডের মেয়েরা আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে।

রমিতা। আর ইউ সিরিয়াস?

হেমন্ত। কি যে বলেন! এসব গুরুতর বিষয়ে কখনও লাইট হওয়া চলে?

এমন সময়ে শমিতা ও হরিশ পাশের ঘর হইতে ঢুকিল। হরিশের হাতে সাদা একখানা কাগজ, তার চারদিকে কালো কালির একটি বর্ডার মাত্র—আর কোন চিহ্ন নাই; এই সাদা কাগজেই নাকি শমিতার ছবি আছে; ছবি কোথাও নাই—কিন্তু ছবি যেন আছে এইভাবে পুরুষেরা কথা বলিবে

হরিশ। খাসনবীশ, দেখ তো ছবিখানা কেমন হ'ল! মিস সরকারের যে বিউটি, আমি তার জষ্টিস করতে পারি নি।

হেমন্ত। ওয়াণ্ডারফুল! দাশ, এত বিনয়ী হ'লে কবে থেকে? বাঃ! বাঃ! মিস সরকার, আপনাকে কন্‌গ্রাচুলেট করছি যে, এমন একখানা পোর্ট্রেট অপনার হ'ল।

শমিতা। আর একটু স্পষ্ট ক'রে থাকলে যেন হ'ত।

হরিশ। কি যে বলছেন মিস সরকার! এর ওপর আর এক পোঁচ রং পড়েছে কি সব মাটি হয়ে গেছে! আপনার কেমন লাগছে মিস রয়?

রমিতা। আমার তো ভালই মনে হচ্ছে।

হেমন্ত। আপনার চোখ খুব তৈরি দেখছি।

রমিতা। শমিতা, তুই জিতে গেলি ভাই।

হেমন্ত। হবে হবে, আপনারও হবে। দুঃখ কিসের?

শমিতা। দিন, ছবিখানা বাঁধিয়ে রাখব।

হেমন্ত। নাকটা কি সুন্দর হয়েছে!

হরিশ। আর কান দুটো!

রমিতা। আমার সবচেয়ে ভাল লাগছে ওর চুলগুলো।

হেমন্ত। আপনার ভাল লাগছে তো?

শমিতা। নিজের ছবি কি কারও খারাপ লাগে? কিন্তু আর একটু স্পষ্ট হ'লে যেন ভাল হ'ত।

হরিশ। কি সর্ব্বনাশ! এর ওপরে আর এক পোঁচ রং পড়েছে কি সব মাটি হয়েছে!

এমন সময়ে অন্য ঘর হইতে সজ্বমিত্রা ও মধু প্রবেশ করিল। মধুর হাতে একটা মাটির পিণ্ড; ওটাকেই পুরুষেরা সজ্বমিত্রার মূর্ত্তি বলিয়া চিনিতে পারিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল

হরিশ ও হেমন্ত। ওয়াণ্ডারফুল! সরকার, তুমি নিজেকেও ছাড়িয়ে গিয়েছ। এত সুন্দর মূর্ত্তি কি ক'রে গড়লে?

মধু। তোমরা সত্যি বলছ, ভাল হয়েছে ?

হেমন্ত। নাঃ, তুমি এত বোঝ, আর এটুকু বুঝতে পার না ?

মধু। মূর্ত্তি যদি সুন্দর হয়ে থাকে, তবে তার জন্যে ধন্যবাদ দাও যাঁর চেহারা তাঁকে।

হরিশ। আমি হার মানছি ভাই, আমার ছবির চেয়ে তোমার মূর্ত্তি অনেক উঁচুদরের জিনিস হয়েছে। আপনার কেমন লাগছে ?

সঙ্ঘমিত্রা। মন্দ নয়, তবে নাককানগুলো একটু স্পষ্ট হ'লে যেন ভাল হ'ত।

মধু। কি যে বলছেন ! একটু এদিক ওদিক হয়েছে কি সব মাটি !

শমিতা। সত্যি ভাই সঙ্ঘমিত্রা, আমার ছবির চেয়ে তোর মূর্ত্তি অনেক ভাল। ওর তবু কিছু বুঝতে পারা যায়, ছবিটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা !

সঙ্ঘমিত্রা। কি যে বাজে বকিস ! তোর ছবিটা অনেক ভাল, আমার মূর্ত্তিটা কেমন যেন মাটি মাটি !

রমিতা। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) তোমাদের তবু যা হোক একটা কিছু হ'ল, আমি একেবারে ফাঁকিতে প'ড়ে গেলাম।

শমিতা। মিঃ সরকার, রমির একটা মূর্ত্তি গ'ড়ে দিন না।

মধু। এর চেয়ে আর আনন্দের কি আছে ? কিন্তু আমরা আজ বড় তাড়াতাড়িতে আছি। এখন ঠিক আটটা।

হেমন্ত। তার মানে আমেরিকায় ঠিক ভোর আটটা।

রমিতা। আপনারা দেখছি আমেরিকার কথা ভুলতেই পারছেন না।

হেমন্ত। কি ক'রে ভুলব বলুন ? এবারে আবার সেখানে ফিরে গিয়ে বারে বারে দক্ষিণ পাড়ার কথা মনে পড়বে।

শমিতা। মিঃ সরকার, আপনাদের এমন কি তাড়া ?

মধু। আর কিছু নয়। কালকে হলিউডে গ্রেটা ডিয়ারির সঙ্গে লাঞ্চ খেতে হবে।

হরিশ। ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছ।

রমিতা। কালকে লাঞ্চ খাবেন হলিউডে, যাবেন কি ক'রে ?

হেমন্ত। এলাম যে ক'রে।

রমিতা। সেই বেলুনে চ'ড়ে ?

হেমন্ত। এবং দিন-রাত্রির সন্ধিক্ষণে পৃথিবী যেই নদীর স্রোতের শুশুকের মত ওলটাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে প্যারাশুট নিয়ে লাফিয়ে প'ড়ে।

রমিতা। ঠিক সেইভাবে যাবেন ?

হেমন্ত। তা ছাড়া আর এত শীঘ্র যাবার উপায় কি ? ওই যে, আপনাদের কি লেক আছে না ? তার কাছে এক আমগাছে এতক্ষণ আমাদের বেলুন বাঁধা থেকে মাতালের মত দুলছে। ঠিক রাত সাড়ে চারটের সময় প্যারাশুট কাঁধে ক'রে তিনজন তাতে চাপব, তারপরে দড়ি খুলে দিলেই বাস—হুস ক'রে বেলুন চ'লে যাবে সেই উঁচুতে। অতবড় বেলুন দেখতে দেখতে আপনার গালের ওই তিলটির মত হয়ে যাবে। তারপরে ঠিক সময় বুঝে প্যারাশুট নিয়ে লাফ।

রমিতা। বাঃ, কি চমৎকার !

মধু। মাঝে মাঝে বিপদে পড়তে হয়। সময় ঠিক করতে না পারলে হয়তো আমেরিকায় পড়তে জাপানে গিয়ে পড়লাম। একবার তো আমি আমেরিকায় নামতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে গিয়ে নেমেছিলাম।

শমিতা। আপনারা কি আনন্দেই আছেন ! যখন তখন যেখানে খুশি যাচ্ছেন, এমন কি পাথেয়ের চিন্তা পর্য্যন্ত করতে হয় না। আর আমরা আছি ঘরে বন্দী হয়ে প'ড়ে।

হরিশ। কি বলছেন! দক্ষিণ পাড়াতেও আপনারা বন্দী?

শমিতা। এই পোড়া দেশেরই দক্ষিণ পাড়া তো।

রমিতা। আচ্ছা, এক কাজ করুন নয়। আমাদের তিনজনকে বেলুনে ক'রে নিয়ে চলুন না কেন?

সঙ্ঘমিত্রা। বাঃ বাঃ, নিয়ে চলুন, নিয়ে চলুন।

শমিতা। ঠিক কথা। নিয়ে চলুন।

হেমন্ত। বাড়িঘর ছেড়ে আপনারা যাবেন?

রমিতা। কেন যাব না? এখানে ব'সে যে দেশের অনুকরণ করছি, সেই দেশে যাওয়া সম্ভব হ'লে কেন ছাড়ব?

হেমন্ত। আপনাদের অভিভাবকরা—

রমিতা। পুঃ—পুঃ—পুঃ—

সঙ্ঘমিত্রা। মনে রাখবেন, আমরা জুলিয়েটের জাতি।

হেমন্ত। চলুন, জুলিয়েটের জাতকে গ্রেটার কাছে নিয়ে পৌছে দোব।

মেয়েরা তিনজনে। গ্রেটার কাছে!

শমিতা। এও কি সম্ভব?

সঙ্ঘমিত্রা। গ্রেট্‌ফুল হয়ে থাকব আপনাদের কাছে।

রমিতা। আমরা হলিউডে গিয়ে সিনেমায় ঢুকব।

হেমন্ত। চমৎকার আইডিয়া। আপনার নাম হবে—রমিটা রয়।

মধু। আপনার নাম হবে—সমিটা সরকার।

হরিশ। আপনার নাম হবে—সঙ্ঘমিটা বোস।

হেমন্ত। এক বছর পরে কলকাতার প্রাচীর আপনাদের ছবির স্পর্শে শিউরে উঠবে, আর হতভাগ্য যুবকের দল সেদিকে তাকিয়ে চলতে চলতে ট্রাম বাস চাপা পড়বে। ওঃ, স্মরণ করতেও গায়ে কাটা দিচ্ছে।

হরিশ। আর ওই যে সেই গানটা, অতিদূর ভবিষ্যতের ওপর ভরসা ক'রে বহুকাল থেকে যা গেয়ে আসা হচ্ছে—

"বল বল বল সবে
শত বীণা বেণু রবে
ভারত আবার জগৎসভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

তার বন্ধ্যা দশা ঘুচবে। তখন সবাই বলবে, সত্যি, এতদিনে ভারত জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নিয়েছে।

মধু। আচ্ছা ভাই, কবি কি ক'রে জানলেন যে, ভারতবর্ষ গানের মজলিসেই শ্রেষ্ঠ আসন পাবে—অন্য কোথাও নয়!

হেমন্ত। ও কথা যাক। বেলুন তো আমাদের আছে—এখন তিনটে প্যারাশুট সংগ্রহ করতে পারলেই হয়।

রমিতা। প্যারাশুট পাওয়া যাবে। আজ বিকেলে মহেন্দ্র দত্তের ছাতার বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্যে তিনটে প্রকাণ্ড ছাতা এ পাড়ায় আনা হয়েছিল। খুব সম্ভব এ দিকেই আছে। ছোকরাদের কাছে থেকে সেই ছাতা তিনটে কিনে নিলেই হবে।

হেমন্ত। চমৎকার! কি উদ্ভাবনী প্রতিভা!

হরিশ। ছাতা থেকে শিক আর বাঁট বাদ দিয়ে ফেলতে হবে।

মধু। তা কি আর ওঁরা জানেন না?

রমিতা। সে সব আমরা ঠিক করব। কখন কোথায় পৌছতে হবে ব'লে দিন।

হেমন্ত। রাত বারোটা, লেকের ধারে। যদিও রওনা হব সাড়ে চারটেয়, তবুও একটু আগে যাওয়াই উচিত।

রমিতা। নিশ্চয়। আমরা ঠিক পৌছব—আমাদের জন্যে ভাববেন না।

সঙ্ঘমিত্রা। তা হ'লে কাল এতক্ষণ আমরা আমেরিকায়! কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না।

শমিতা। সঙ্গে কিছু শীতবস্ত্র নিতে হবে ?

হেমন্ত। নেবেন। না নিলেও ক্ষতি নেই। গ্রেটার গায়ের জামা চেয়ে আপনাকে দোব। আপনাদের দেহ প্রায় এক মাপের। তা হ'লে আমরা এখন আসি।

রমিতা। আসুন। গুড মর্নিং। গুড মর্নিং।

মধু। সন্ধ্যাবেলা গুড মর্নিং !

রমিতা। আমেরিকার ঘড়ি অনুসারে। সেখানে যে এখন সকাল আটটা।

হেমন্ত। দেখেছ দাশ, কি বুদ্ধি ! গুড মর্নিং।

মধু ও হরিশ। গুড মর্নিং। গুড মর্নিং।

হেমন্ত। গুড মর্নিং। এই নিন, ধরুন তো।

এই বলিয়া সে একটা কিস থ্রো করিল—ঠিক একটা বস্তু ছুঁড়িবার ভঙ্গি ; মেয়েরা তিনজনে লাফাইয়া উঠিয়া সেই উড্ডীয়মান অদৃশ্য কিসকে ধরিবার উদ্যম করিল

হেমন্ত। নাঃ, পারলেন না—জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেল। ওই যাচ্ছে, ওই যাচ্ছে, ওই দূরের লাল বাড়ির দোতলার বারান্দা থেকে একটা মেয়ে চট ক'রে ধ'রে নিলে।

রমিতা। নিশ্চয় বিমি বোস। মেয়েটা বড্ড স্মার্ট।

হেমন্ত। দুঃখ করবেন না। বিমি বোস এখানেই প'ড়ে থাকবে, আপনারা কাল এতক্ষণে আমেরিকায়।

আবার উভয় পক্ষে গুড মর্নিং অভিবাদন

মধু। রাত বারোটায়—লেকের ধারে।

হরিশ। প্যারাশুট নিতে ভুলবেন না।

হেমন্ত। Au revoir !

গুনগুন করিয়া সে গান ধরিল ; গান গাহিতে গাহিতে অপর দুইজনের প্রস্থান

"Kiss, Kiss, Kiss,
Bliss, Bliss, Bliss,
Kissing may be naughty,
But it's nice."

প্র. না. বি.

বল্লভপুরের মাঠ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পুরুষকে আমি অস্ত্র তুলিয়া লইতে আদেশ করিলাম। দস্যুর সর্দ্দার সম্মান প্রদর্শন করিয়া হাসিলেন। তাহার পর বলিলেন, আপনি ছোরা ব্যবহার করিতে পারেন। আমি নিরস্ত্র হইলেও আত্মরক্ষার স্পর্দ্ধা রাখি। আমাদের বচসার মাঝে দস্যুর দল নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। বুঝিলাম, সর্দ্দার প্রভুত্ব কি ভাবে করিতে হয় তাহা জানে। আমি উত্তর করিলাম, নিরস্ত্রের বিরুদ্ধে কখনও অস্ত্র ব্যবহার করি নাই। তোমার পৌরুষ থাকিলে লোকবলের শক্তি লইয়া দাম্ভিকতা প্রকাশ করিতে না। তুমি বীর স্বীকার করিতেছি। কিন্তু এখন আমার নিকট অস্ত্র আছে। শক্তির অভাব না হইয়া থাকিলে আমার শাণিত ছোরাকে তোমার দীর্ঘ তরবারি দিয়া অভ্যর্থনা কর।

পুরুষ বলিলেন, মহারাণী, এখন তর্কের সময় নাই। আপনি অস্ত্র ব্যবহার করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেই আমরা গন্তব্যস্থানে যাইতে পারি। আপনি আমার বন্দী।

জীবনে কখনও সাধারণকে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আদেশের স্বরে এই ভাবে কথা বলিতে শুনি নাই। নিজের শক্তির প্রতি এইরূপ অটল বিশ্বাসও কাহারও দেখি নাই। ভাষাও মার্জ্জিত, অথচ দৃঢ়। আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিতে হইলে মনে যথেষ্ট বলের প্রয়োজন হয়।

আমি জোর দিয়াই বলিলাম, আমি কে জানিলে তোমার ধৃষ্টতা দেখাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে। গুরু শ্যামসুন্দরের নাম নিশ্চয় শুনিয়াছ, আমি তাঁহার প্রধানা শিষ্যা।

দলপতি শান্তভাবে উত্তর করিলেন, আচার্য্য শ্যামসুন্দরকে আমি চিনি, এবং ইহাও জানি আপনি মহারাণী দুর্গাদেবী, যাঁহার প্রতাপের খ্যাতি দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এবং যে খ্যাতির আশ্রয় লইয়া কুলটারা দিনের পর দিন নির্ব্বিবাদে সংখ্যা বাড়াইয়া চলিয়াছে।

কোতোয়ালির সর্ব্বাধিকারী হইতে আরম্ভ করিয়া স্বয়ং দেওয়ান পর্য্যন্ত ভদ্রমহিলাকে কুলটা প্রমাণ করাইয়া বলপ্রয়োগে তাহাদের ভোগ করিতেছে। বিশৃঙ্খলা দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রধান বিচারপতির উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আপনি এই অঘটন ঘটাইয়াছেন। পূজনীয় শ্যামসুন্দর আপনার গুণকীর্ত্তন এমনভাবেই করিতেন, যাহাতে অনেক সময় আপনাকে দেবী ভাবিয়াছি। আজ মানবীকে দেখিয়া দুঃখিত হই নাই, তবে দেবী ভাবিতে পারিতেছি না। কত দিন ধরিয়া এই শুভ মুহূর্ত্তটির জন্য অপেক্ষা করিয়াছি, আপনি হয়তো জানেন না। শুধু আপনাকে দেখিবার জন্য কত সময় নিজের কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া আপনার ঘোষণা শুনিবার উদ্দেশ্যে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়াছি। দূর হইতে আপনাকে দেখিতাম, কারণ নিকটে আসিবার উপায় ছিল না—আমার মাথার দাম অযথা অত্যন্ত বেশি হওয়ায়। আমার মাথার বিনিময়ে প্রচুর অর্থ ঘোষণা করিয়া এই নগণ্য বস্তুকে কেন যে দুর্মূল্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কৌতূহল দমন করিতে পারিতাম না। আমার সম্বন্ধে আপনি ঘোষণাপত্র পড়িবেন—ডঙ্কার দ্বারা প্রচারিত হইলেই আমি সেই স্থানটিতে ভিড়ের মাঝে অপেক্ষা করিতাম এবং আপনাকে দূর হইতে প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিতাম। আপনার রূপে মুগ্ধ হইয়া যাইতাম। কি বলিতেন, তাহা হয়তো অনেক সময় শুনিতামও না। আপনার রূপ আমাকে উন্মাদ না করিলে আজ হয়তো অশিক্ষিত লস্করগুলি প্রাণ হারাইত না। নেহাৎ মহিষের মত গুঁতাইতে আসিয়া লোকগুলি মারা পড়িল।

দস্যুর নির্লজ্জ আচরণ সহ্য করিতে পারিলাম না। বাধা দিয়া রূঢ়ভাবে বলিলাম, মানুষ মারিয়া আলাপ করা কি তোমার নিত্য কর্ম্ম?

দলপতি উত্তর দিলেন, মানুষ মারাই আমার ধর্ম্ম নয়। তবে প্রয়োজন বোধ করিলে বধ করিতে আমার বাধে না। আমি যাহাদের মারি; তাহারা অনেক সময় অস্ত্রের সাহায্য লইয়া আত্মরক্ষার অবকাশ পায়। কিন্তু আপনি বিচারের অছিলায় সামান্য কোতোয়ালের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া কত সময় নিরীহ মানুষকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

সামান্য দস্যু রাজনীতির সন্ধান রাখে কি করিয়া? কৌতূহলী হইয়া উঠিতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার নাম কি?

দস্যুদলপতি তেজোময় মূর্ত্তি লইয়া উত্তর করিল, সর্দ্দার রঘুনন্দন ছাড়া আপনার অসি দ্বিখণ্ডিত করিতে পারে কে? পূজনীয় শ্যামসুন্দর আমার পিতা। আমার অসিশিক্ষা পিতৃদেবের নিকট।

স্তব্ধ হইয়া গেলাম। প্রাতঃস্মরণীয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ গুরুদেব শ্যামসুন্দরের পুত্র রঘুনন্দন দস্যুর দলপতি! এই রঘুনন্দনের মাথার জন্য নিজে সাধারণের সামনে দাঁড়াইয়া কতবার লোভনীয় পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছি, কিন্তু কেহই সন্ধান দিতে পারে নাই। আজ সেই দস্যুর সামনে নিতান্ত অসহায়ভাবে বন্দী হইয়া দাঁড়াইয়া আছি। মন ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল। নিজেকে তিরস্কার করিলাম, নীচের প্রতি আসক্ত হইয়াছিলাম বলিয়া। অত্যন্ত অবজ্ঞার সহিত বলিলাম, দস্যুবৃত্তি তোমার জীবিকা, লুণ্ঠনের দ্বারা অর্থসংগ্রহ করাই তোমার বাঁচিয়া থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমাকে ছাড়িয়া দিলে প্রচুর অর্থ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে; আমাকে বিশ্বাস করিতে পার। তবে তুমি যাহা পাইবার আশায় এতগুলি প্রাণীহত্যা করিলে তাহা পাইতে হইলে আর একটি জীবকে মরিতে হইবে। আমার জীবন্ত দেহ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে নিতান্তই জড় করিয়া দিব। আমি মৃত্যুকে কখনও ভয় করিতে শিখি নাই।

রঘুনন্দন উত্তর করিল, বর্ত্তমান ঘটনার সহিত অর্থের কোন সম্বন্ধ নাই এবং যদি থাকিত, তাহা হইলেও আপনি দিতে পারিতেন না, কারণ দেওয়ান আপনার রাজকোষ নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে। রাজকর্ম্মচারীরা বেতন পাইতেছে না, সব কয়টি পুষ্করিণী কাটার কাজ বন্ধ হইয়াছে; সংক্ষেপে অরাজকতার সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় দেওয়ানকে বধ না করিয়া উপায় ছিল না। দেওয়ান বধ হইলেও রাজ্য যাহাতে সহজভাবে চলে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছি। রাজ্য সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। আপনার রাজ্য এবং সৈন্য সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিবার আছে। তবে ইহা উপযুক্ত স্থান ও সময় নহে। আমার সঙ্গে চলুন, পরে বলিব।

রঘুনন্দন প্রত্যেকটি কথা এমন দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করিল যে, তাহা না মানিয়া উপায় ছিল না। মনে হইতেছিল, সুন্দর পুরুষ যেন আদেশ মানাইবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমি বন্দী—স্বীকার করিলাম। অদূরে পানসি ও বজরা অপেক্ষা করিতেছিল। রঘুনন্দন সেই দিক নির্দ্দেশ করিয়া অগ্রগামী হইতে অনুরোধ করিল।

এইখানে নারী যেন কি ভাবিতে লাগিলেন। তাহার পর খানিকটা দম লইয়া আবার বলিয়া চলিলেন—

বজরায় আসিয়া উঠিলাম। যে কয়জন দাসী জীবিত ছিল, তাহাদের কি হইল জানিতে পারিলাম না।

দিনের আলো অল্প সময়ের ভিতর তমসাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। দাঁড়ের ছপছপ শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শুনিতে পাইতেছি না। সামনের জানালাটা খুলিয়া কালো জলের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। আশ্চর্য্য হইলাম, একটি দাঁড়ীও কথা বলিতেছে না। রঘুনন্দন আমার সহিত চলিয়াছে কি না, তাহাও জানিবার উপায় নাই। রঘুনন্দনের অতুলনীয় রূপের প্রভাব সকল সংস্কার চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিতেছিল। তাহার চরিত্র ভাবিতে গিয়া ঘৃণায় মন তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল। তথাপি তাহার চিন্তা মন হইতে সরাইয়া দিতে পারিতেছিলাম না। সকল নীতির বাধা অসঙ্গত বিচারে নিজেই ধ্বংস করিয়া দিতেছিলাম—তাহার দেহ স্পর্শ করিবার জন্য প্রাণ মাঝে মাঝে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। সেই প্রথম পুরুষ, যে নিঃসঙ্কোচে আমার রূপের প্রশংসা করিয়াছিল, নিরবচ্ছিন্ন নারী হিসাবে পাইবার কামনা রঘুনন্দন ছাড়া আর কেহ করে নাই। এই সূত্রে স্থবির বৃদ্ধ স্বামীর কথা মনে পড়িল। বাসরঘরের কথা ভাবিতে লাগিলাম। বাসররাত্রির পর একদিনের জন্যও স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করি নাই। অন্দর-মহল ও বাহিরের মাঝে কঠিন ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিলাম। মহারাজা বহু সাধ্য-সাধনা করিয়াও আমার নিকট আসিতে পারেন নাই। রঘুনন্দন নীচ দস্যু; তবে কেন তাহার সান্নিধ্যের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি! সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। যখন এইরূপ সম্ভব এবং অসম্ভব অনেক কথা ভাবিতেছিলাম, হয়তো সেই সময়ের ভিতর আমার বজরা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া ফেলিয়াছিল। হঠাৎ তীব্র আলোকরশ্মি মুখে পড়ায় চমকিত হইয়া উঠিলাম। সামনের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেই দেখিলাম, অদূরে একটি বৃহৎ সমুদ্রগামী জাহাজ। আকার তাহার ফরাসী ধরনের। জাহাজের উপর লোকে লোকারণ্য। সকলেই ব্যস্ত, ছুটাছুটি করিতেছে। বিদেশী সুরের সহিত দেশী তাল মিশ্রিত হইয়া হাওয়ার তরঙ্গে সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে। যেন একটি মহা উৎসবের সূচনা মাত্র। ডাকাত মহারাণী দুর্গাদেবীকে বন্দী করিয়াছে। সংবাদটি নিশ্চয় পানসির লোকেরা বহু আগেই পৌছাইয়া দিয়াছে। বড় রকমের উৎকোচের ব্যবস্থা হইয়াছে—রঘুনন্দন নিশ্চয়ই ফরাসী দস্যুর আজ্ঞাবহ সামান্য একটি দলের সর্দ্দার মাত্র। ফরাসী দস্যুরাজ যাহা আদেশ করিয়াছেন, রঘুনন্দন তাহাই পালন করিয়াছে। এইবার বেশ ভীত হইয়া পড়িলাম। আমি কি তাহা হইলে ম্লেচ্ছের ভোগ-লালসা মিটাইবার জন্য চলিয়াছি? অসম্ভব। আমার হীরক-অঙ্গুরীয়ের দিকে তাকাইতেই নিশ্চিন্ত হইলাম। ইহার তলায় যে বিষ আছে, তাহা যে কোন মানুষকে শেষ করিতে আধ মিনিটের বেশি সময় লাগিবে না। ম্লেচ্ছ আমার দেহ স্পর্শ করিবে? মনে মনে হাসিলাম। তাহার পর বাস্তবিকই হীরক উত্তোলন করিয়া দেখিলাম। সিক্ত পাতলা তুলায় হলাহল যথাস্থানে রহিয়াছে। মৃত্যুর লোল জিহ্বা যেন লকলক করিতেছে। কি সাংঘাতিক আকর্ষণী শক্তি তাহার! হৃদয় দুরু দুরু করিয়া উঠে। হীরক দ্বারা হলাহল আবৃত করিলাম। মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি, তথাপি হৃদয়ে এই কম্পন কেন? মনে মনে হাসিলাম।

ইতিমধ্যে আমার বজরা জাহাজের আরও নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। সহসা নৌকা হইতে তূরীধ্বনি হইল। সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য প্রতিধ্বনি শুনিলাম জাহাজের উপর হইতে। বজরা আরও নিকটে আসিতেই জাহাজের আলো একের পর এক নিবিয়া গেল। অদ্ভুত আচরণ! পরক্ষণেই অনুমান করিলাম, বজরার তলা মাটি স্পর্শ করিয়াছে। আমার নিজের বজরায় এইরূপ ঘটিলে মাঝী ও দাঁড়ীর দল চীৎকার করিয়া হাট বসাইত। নিঃশব্দে নোঙ্গর ফেলা হইল।

তাহার পর দেখিলাম, দুই তলা সমান উঁচু জাহাজের প্রান্ত হইতে একজন শ্বেতাঙ্গ সেনাপতির বেশে নামিয়া আসিতেছেন। পিছনে সৈন্যদল। সকলের হাতেই বিদেশী আলো। অঙ্গুরীয়ের প্রতি আর একবার তাকাইলাম। উৎসবের আয়োজন কিসের, জানিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু সেনাপতির ব্যবহার কিরূপ হইবে যতক্ষণ না বুঝিতেছি, ততক্ষণ জাহাজের উপর যাওয়া উচিত হইবে কি? মনকে নানা প্রশ্নে অস্থির করিয়া তুলিলাম।

সেনাপতি আমার সামনে আলো ধরিয়া সামরিক প্রথায় অভিবাদন করিলেন। তাহার পর দক্ষিণ হস্ত বক্ষে রাখিয়া বাম হস্ত দ্বারা গম্য পথ দেখাইয়া দিলেন। কেন জানি না, রঘুনন্দনকেই এখন পরম বন্ধু বলিয়া মনে হইতেছিল। কই, তিনি তো এখানে নাই, ম্লেচ্ছকে বিশ্বাস করি কি করিয়া? ছোরা দেহকে স্পর্শ করিয়াছিল, কিছু অভয় পাইলাম। কিন্তু ম্লেচ্ছকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। বিশ্বাস করি বা না করি, আদেশ না মানিয়া উপায়ই বা কি আছে?

আমি সেনাপতিকে অনুসরণ করিলাম। পথ শূন্যে ঝুলিতেছে। অর্দ্ধ হস্তের অধিক প্রশস্ত নহে। পায়ের তলায় কয়েকটি কাঠের তক্তা বাঁধা। দুই ধারে মোটা নারিকেল-রজ্জু চলিবার সময় ওজনের সমতা ঠিক রাখিবার জন্য পথের তিন হস্ত উপরে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অনভিজ্ঞ সন্তর্পণে দড়ি ধরিয়া না চলিলে গভীর জলে যে কোন সময় পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা খুব বেশি। সেনাপতি অবলীলাক্রমে দোদুল্যমান পথটি অতিক্রম করিয়া জাহাজের অতি উচ্চ মঞ্চে গিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আমি কোন প্রকারে দুলিতে দুলিতে উপরে উঠিতে লাগিলাম। আলোর ক্ষীণ রশ্মিতে মনে হইল, রঘুনন্দন ফরাসী সেনাপতির পিছনে উর্দ্ধতর মঞ্চে দাঁড়াইয়া আছেন। মাঝপথে আসিয়াছি, এমন সময় কি কারণে বলিতে পারি না, দোলায়মান রজ্জুপথে টাল সামলাইতে না পারিয়া গভীর জলে পড়িয়া গেলাম।

সাঁতারে আমার পারদর্শিতা ছিল। কিন্তু অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়িয়া যাইবার জন্য কোন ভাবেই সাবধানতার আশ্রয় লইতে পারিলাম না। অনুভব করিতেছিলাম, বালি স্পর্শ করিয়াছি। একটি কোন সজীব

পদার্থ আমাকে বেষ্টন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, উহার কবল হইতে নিস্তার নাই। এদিকে সিক্ত শাড়িও ঘনীভূতভাবে আমাকে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। কিছুক্ষণ নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সফল হইলাম না। হাতে বাঁধন পড়ে নাই। যতই আমি বলপ্রয়োগ করিতে লাগিলাম, ততই বেশি করিয়া জড়াইয়া যাইতে লাগিলাম। ক্রমে আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল; জ্ঞানও লুপ্ত হইতেছিল। এমন সময় মনে হইল, কঠিন মাংসপেশীযুক্ত কাহার বাহু আমার বক্ষের নীচে হইতে সাংঘাতিক শক্তির দ্বারা উপরে ঠেলিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। একবার দুইবার—এই ভাবে আমার ত্রাণকর্ত্তা চেষ্টা করিলেন। তাহার ঠিক পরের ঘটনা আমার মনে নাই।

সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরিয়া আসিতে দেখিলাম, আমি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুইয়া আছি। ঘরটি অনতিপ্রশস্ত। পাশ্চাত্যদের অনুকরণে সজ্জিত। আমার পার্শ্বেই একটি স্ত্রীলোক, হয়তো দাসী—হাতপাখার দ্বারা ব্যজন করিতেছে। তাহার পার্শ্বে পীঠিকা—পীঠিকার উপর একটি জলপাত্র। তথা হইতে তীব্র সুরার গন্ধ উঠিতেছে। আমার মুখেও গন্ধ পাইলাম। জল হইতে উত্তোলন করিয়া হয়তো আমাকে পান করাইয়া দিয়াছিল। আমার উদ্ধারকর্ত্তা নিশ্চয়ই রঘুনন্দন;—বাহুতে অত শক্তি রঘুনন্দন ছাড়া আর কাহারও থাকিতে পারে?

দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি কোথায়?

দাসী উত্তর করিল, জাহাজে।

জাহাজ কোথায় চলিয়াছে?

দাসী কোন উত্তর দিল না। আবার প্রশ্ন করিলাম, জাহাজ কোথায় চলিয়াছে?

উত্তর নাই। প্রভুর আদেশানুসারে দাসী প্রশ্ন যাচাই করিতেছে, সুতরাং কিছু জানিবার চেষ্টা বৃথা। আমি পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কাঠের উপর বহু লোকের দ্রুত গমনাগমনের আভাস পাইতেছিলাম। খাঁটি ফরাসী

বিদেশিনীর মৃদু রসযুক্ত তিরস্কারও শুনিয়াছিলাম—হয়তো সেই সেনাপতির স্বদেশী প্রেমিকা।

সেনাপতির দেশ বিদেশ ঘুরিয়া হয়তো স্ত্রীরত্ন সংগ্রহ করা আর একটি নেশা। পুরুষ একের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিতে চায় না। নূতনের প্রতি উহাদের সাংঘাতিক আকর্ষণ। ইহা উহাদের স্বভাবদোষ; কিছু বলিবার নাই। রঘুনন্দন আমাকে জয় করিল। কিন্তু আমি চলিয়াছি ম্লেচ্ছের ভোগের জন্য। আরও কত কথা ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

কপালে পুরুষের তালু স্পর্শ করিতেই ঘুম ভাঙিয়া গেল। অর্দ্ধ-জাগ্রত অবস্থায় দেখিলাম, রঘুনন্দন আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কপালে অতি মৃদুভাবে হাত বুলাইতেছেন। কি দীপ্তিময় কান্তি! কিছুতেই দস্যু ভাবিতে মন চায় না। নীচ দস্যু আমাকে অবাধে স্পর্শ করিতেছে, আমি কিছু বলিতে পারিতেছি না। তাঁহার স্পর্শে অবর্ণনীয় আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম। নীতি, সঙ্কোচের বাধা আনিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সফল হয় নাই। তাঁহার হাতটি নিজের মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিতেই চারিত্রিক সংস্কার যেন চাবুক মারিয়া জানাইয়া দিল, তুমি হিন্দু বিধবা, তুমি মহারাণী—ও অধিকার তোমার নাই। ধিক্কারে মন ভরিয়া উঠিল। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রূঢ়ভাবে বলিলাম, স্পর্শ দ্বারা আমার দেহ কলুষিত করিও না। রঘুনন্দন কিন্তু উঠিল না। আদেশ অগ্রাহ্য হওয়ায় অপমানিত বোধ করিতেছিলাম। পূর্ব্ব-দুর্ব্বলতা ভুলিয়া গেলাম। বলিলাম, পশু! বন্দী করিয়া আমাকে ভোগ করিতে চাও? এ সুযোগ তোমার মত কাপুরুষেরাই লইয়া থাকে। তুমি গুরু শ্যামসুন্দরের পুত্র হইতে পার না।

রঘুনন্দনের বিশাল বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল—ক্রোধে নয়, দুঃখের দীর্ঘনিশ্বাস অন্তর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসিল। আমার প্রত্যেকটি কথা দারুণভাবে তাঁহাকে আঘাত করিয়াছিল। তিনি হাত কপাল হইতে তুলিয়া লইলেন, নির্ব্বাক প্রতিবাদে আমাকে জর্জ্জরিত করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। দরজা বন্ধ হইবার পূর্ব্বে

পিছন হইতে তাঁহার গঠনের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলাম। দৃষ্টি ফিরাইবার শক্তি ছিল না, উলঙ্গ পৃষ্ঠে শুভ্র যজ্ঞোপবীত আজানুলম্বিত অবস্থায় ঝুলিতেছে। সর্ব্ব দেহ মন পবিত্রতায় মূর্ত্তিময় হইয়া উঠিয়াছে।

ভাবিলাম, একবার ডাকিয়া বলি—ওগো চিরবাঞ্ছিত, একবার তুমি নিজমুখে জোর দিয়া বল, দস্যুবৃত্তি তোমার পেশা নয়; তুমি ব্রাহ্মণ-সন্তান—গুরু শ্যামসুন্দর সত্যই তোমার পিতা। ওগো, তোমাকে বিশ্বাস করিতে চাই, তোমাকে ভালবাসিতে চাই, তোমার দাসী হইয়া থাকিতে চাই। সশব্দে দ্বার বন্ধ হইয়া গেল। আমি আবার কঠোর হইয়া উঠিলাম। পরক্ষণেই ভাবিলাম, চলিয়া গেল? কি দোষ করিয়াছি আমি? আমার রূঢ়তা যে নিতান্তই বাহ্যিক! উহা তো আমার হৃদয়ের বাণী নহে! কেমন করিয়া বুঝাই, মহারাণী দুর্গাদেবী ও আমার অন্তরের নারী এক নয়? নিজের ব্যবহারে দগ্ধ হইতেছিলাম, অবসাদ আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ক্লান্তি বোধ করিতেছিলাম; শয্যার আশ্রয় লইলাম।

জাহাজ চলিয়াছে। মৃদু দোলায় ঝাড়ের ঠুনঠান শব্দ ঘরের বাহিরে সঙ্গীতের তানে কোন কোন পর্দ্দায় মিলিয়া যাইতেছে। অন্য সময় হইলে মুগ্ধ হইয়া শুনিতাম। কিন্তু একজনের অনুপস্থিতে সব কিছুই প্রাণহীন মনে হইতেছিল। দুর্ব্বলতা ও সুরার হালকা প্রভাব তখন কাটিয়া গিয়াছে।

উঠিয়া বসিলাম। ঘরের ভিতর তখন কেহই ছিল না। তাঁহাকে শুধু দেখিবার আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে পারিলাম না। জানালাটার দিকে অগ্রসর হইতে যাইব, এমন সময় দাসী প্রবেশ করিল। হস্তে তাহার স্বর্ণপাত্র—কিছু ফল ও ভক্ষণীয় লইয়া আসিয়াছে। খাদ্যে কিছুমাত্র স্পৃহা ছিল না। প্রত্যাখ্যান করিয়া নির্লজ্জের মতই জিজ্ঞাসা করিলাম, দস্যুদলপতি রঘুনন্দনের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে না?

যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া দাসী প্রতিবাদ করিল, রঘুনন্দন দস্যুদল-পতি নহেন; তিনি মহারাজ রঘুনন্দন। বুঝিলাম, ইহা একটি চমৎকার অভিনয়ের সূত্রপাত। বলিলাম, মহারাজ! রাজ্যহীন মহারাজাকে একবার

ডাকিতে পার? যুবতী কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অত্যন্ত বিনম্র-ভাবে উত্তর করিল, মহারাজা রঘুনন্দনের রাজ্য বহুবিস্তৃত। রাজধানী মাটির তলায়। বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম। কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। প্রশ্ন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। মাটির তলায় রাজধানী? সে কোথায়? কোন উত্তর পাইলাম না। তখন রঘুনন্দনের সাক্ষাৎ লাভের জন্য দাসীকে নিতান্ত কাতরভাবে অনুরোধ করিলাম।

দাসী অতি বিনীতভাবে করজোড়ে জানাইল, মহারাণী! আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। মহারাজার নিকট যাইবার অধিকার আমার মত সামান্য দাসীর নাই। তিনি যদি আসেন তো নিজেই এদিকে আসিবেন। এখন তিনি ফরাসী সেনাপতির সহিত মন্ত্রণা-ঘরে ঢুকিয়া-ছেন। দূত শত্রুপক্ষের অপ্রস্তুত অবস্থার সংবাদ আনিয়াছে—আজ রাত্রেই বোধ হয় যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া জাহাজ চালানো হইবে। আমরা আপনাকে আপনার রাজ্যের নিকট পৌছাইয়া দিবার জন্য আসিয়াছি। আমাদের বজরার সহিত বারোটি পানসিতে সশস্ত্র সৈন্য যাইবে। পথে বিপদের সম্ভাবনা নাই।

বিপদের কথা উত্থাপন করিতেই একটা রূঢ় কিছু বলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছিলাম। যুবতী জানে না, বিপদকে আমি কতটা অবহেলা করিয়া থাকি। যাহা ভাবিতেছিলাম, তাহা প্রকাশ করিলাম না। নিজেকে সংযত করিয়া আবার মহারাজার দর্শন লাভের জন্য দাসীকে অনুরোধ করিলাম।

দাসী বিব্রত হইয়া পড়িল। মস্তক নত করিয়া স্বর্ণপাত্র আমার দিকে অগ্রসর করিয়া বলিল, মহারাজার অনুরোধ—কিছু আহার করুন। মহারাজা রঘুনন্দন সদ্‌ব্রাহ্মণ; আমি অস্পৃশ্যা নহি।

মনের ক্ষুধা মহারাজা বোঝেন নাই। দৈহিক ক্লেশ নিবারণের জন্য অন্ন পাঠাইয়াছেন। তাহা হউক, মহারাজার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিব না—পাত্র হইতে দুই একটি ফল তুলিয়া লইলাম।

হঠাৎ কামানের গর্জ্জন রাত্রের নিস্তব্ধতা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিল। পরক্ষণেই চতুর্দ্দিকে তূরীর আওয়াজে প্রস্তুত হইবার সঙ্কেত শুনিলাম। দামামা ও রণডঙ্কার সহিত নৌসেনারা জয়োল্লাসে আকাশ বিদীর্ণ

করিয়া দিল। যেন তাহারা কখন পরাজিত হয় নাই। বিদেশী ভাষায় একদল সৈন্য চীৎকার করিয়া উঠিল—ভাইভা লে মহারাজা রঘুনন্দন, ভাইভা লে মন্‌সিয়ের। তাহার প্রত্যুত্তর আসিল দেশী সৈন্যদের দৃঢ়তর উচ্চারণে—জয় মহারাজা রঘুনন্দনের জয়, জয় মন্‌সিয়েরের জয়।

দেশী বিদেশী সৈন্যেরা মহারাজা রঘুনন্দনের অধীনে একত্র মিলিত হইয়া চলিয়াছে আত্ম-বলিদানের জন্য। মহারাজার সৈন্য-চালনায় তাহাদের কি অটল বিশ্বাস! চীৎকার করিয়া বলিতে চাহিলাম, বীর রঘুনন্দন, তুমি শুধু সৈন্যদের মহারাজা নহ—তুমি শুধু মন্‌সিয়েরের মহারাজা নহ, তুমি আমারও মহারাজা। পরক্ষণেই ভাবিলাম, যুদ্ধ কাহার সহিত? এই বিপুল বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা কোন্ প্রবল-পরাক্রমশালীর বিরুদ্ধে? দাক্ষিণাত্যের এই যুদ্ধে যোগ নাই তো? বাংলার নবাব কি তাহা হইলে—? চিন্তা বৃথা। কে আমাকে সদুত্তর দিবে? মহারাজকে অন্তর্য্যামী ভাবিতে ভাল লাগিল। মিনতি করিয়া জানাইলাম, মহারাজ, আমাকে যুদ্ধে লইবে না? মহারাণী দুর্গাদেবী কি ভাবিতেছ, মরিয়াছে? ওগো মহারাজ, অসি-চালনায় তোমাকে গুরু বলিয়া মানিতে রাজি আছি। কিন্তু আমার যেটুকু দক্ষতা আছে, তাহার অবমাননা করিও না। আমাকে যুদ্ধে সঙ্গী করিয়া লও। আমাকে তোমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তোমার দেহরক্ষী হইতে দাও। তোমার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া জীবন সার্থক করি।

আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলাম। দাসীর দুইটা হস্ত বক্ষে টানিয়া লইলাম। ভিক্ষার্থীর মত তাহার কৃপা চাহিলাম। যুদ্ধে যাইবার আগে একবার মহারাজার দর্শন পাইব না কি? দাসীর সামনে আমার সকল অহমিকা নত করিয়া বলিলাম, শুধু তাঁহার পদধূলি লইয়া শেষ বিদায় চাহিব—আমার এই প্রার্থনাটি প্রত্যাখ্যান করিও না।

সামান্য দাসী হইলেও সে নারী। মহারাণী দুর্গাদেবীর নিটোল নরম বক্ষের নিগূঢ় অন্তরে যে উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল, তাহা সে বুঝিয়াছিল। চক্ষু তাহার জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। আমাকে স্থিরভাবে একবার দেখিল। তাহার পর ভীতভাবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। হৃদয় তখন কি ভাবে স্পন্দিত হইতেছিল, বলিতে পারি না। অনতি-

বিলম্বেই মহারাজ কঠোরভাবে আদেশ করিলেন, বাঁদীকো কোতল করো—অভি।

প্রতিটি মুহূর্ত্ত এক একটি দণ্ডের মত মনে হইতেছিল। আকস্মিক পদশব্দে চমকিত হইয়া উঠিতেছিলাম। প্রত্যেকটি পদশব্দে মহারাজার আনুমানিক আগমন-বার্ত্তা আমার বক্ষকে স্পন্দিত করিয়া তুলিতেছে হৃদয়ের দারুণ আলোড়নে। প্রতি বারই শব্দ দ্বার অতিক্রম করিয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল আমাকে প্রতারিত করিয়া। বুঝিলাম, দাস্তিকার শাস্তি সুরু হইয়াছে। যদি হইল তো মহারাজা সাক্ষাৎ দিয়া আরও কঠোরতর যন্ত্রণার ব্যবস্থা করিলেন না কেন? দয়া ও সম্মান মহারাণীর প্রাপ্য; আমার নয়। আমি নারী। স্থবির রঘুনন্দন বুঝে নাই বুভুক্ষু নারীর অন্তরের ক্ষুধা। একদৃষ্টে দরজার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মহারাজার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। মহারাজা আসিলেন না, দাসীও ফিরিল না।

হঠাৎ আবার কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল। দামামা ও ডঙ্কার শব্দ অনুসরণ করিয়া বুঝিলাম, নৌসেনার দল ক্রমে দূরে চলিয়া যাইতেছে, কি দ্রুত গতি তাহাদের! নৌবাহিনী যুদ্ধযাত্রার পথে চলিয়াছে। দাসীও ফিরিয়া আসিল না। দাসী ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার অনতিকাল পরেই মহারাজা হুকুম দিয়াছিলেন, বাঁদীকো কোতল করো—অভি। সামরিক আইন লঙ্ঘন করায় তবে কি দাসী আমার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিল? বেদনায় মর্ম্মাহত হইয়া পড়িতেছিলাম, এমন সময় রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল। মহারাজ যোদ্ধবেশে প্রবেশ করিলেন। রণবেশে তাঁহাকে বিশ্ববিজেতার মত লাগিতেছিল। মুগ্ধ হইয়া স্থিরভাবে তাঁহাকে দেখিতেছিলাম। লজ্জার কোন আবরণ টানি নাই। চোখের ভাষা অকপটতা সরলভাবে প্রকাশ করিতেছিল, মহারাজা নিশ্চয় তাহা বুঝিয়াছিলেন।

যে জীবন্ত দেবতার চরণতলে নিজেকে বিলাইয়া দিবার জন্য এতক্ষণ প্রস্তুত হইতেছিলাম, তাঁহাকেই নিকটে পাইয়া বাক্‌রোধ হইয়া গেল। নারীর আদি প্রকৃতি ও নীতির সংস্কার চিতার দাবানলের মত আমাকে দগ্ধ করিয়া দিতে লাগিল। মহারাজা সামরিক প্রথায় আমাকে

অভিনন্দন জানাইলেন। তাহার পর স্থিরভাবে আমার সর্ব্ব দেহ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দৃষ্টিতে তাঁহার স্পর্শ-শক্তি ছিল, ভালই লাগিতেছিল।

মহারাজা দরজার নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। ভোগের অত্যন্ত লোভনীয় বস্তু অতি নিকটে এবং সম্পূর্ণ নিজের কবলে পাইয়াও তাহা দাবি করিলেন না। মুখাবয়ব হইতে মনে হইল, তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম অভ্যন্তরে দুঃখের ঝটিকা দুর্দ্দমনীয় প্রবাহে ঘূর্ণ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। অকস্মাৎ বিস্ফোরণে হয়তো প্রত্যেকটি পাঁজরার অস্থি লৌহবর্ম্ম ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া আমারই সামনে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। কিন্তু সৈনিক বিরাট শক্তি দ্বারা নিজেকে সংযত করিয়া রাখিয়াছেন। উভয়ের দৃষ্টিই উভয়ের প্রতি গাঢ়ভাবে আবদ্ধ—উভয়ের অন্তর একই ঝটিকায় ঘোরতরভাবে আন্দোলিত হইতেছে। কিন্তু বাহ্য প্রকাশে উভয়েই প্রতারণার আশ্রয় লইয়াছি। মহারাজ সংযমী, আমি বাক্‌হীন।

এই অবস্থায় বেশ খানিকটা সময় কাটিয়া গেল। তূরীধ্বনি হইতেই মহারাজা বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তাহার পর বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কি যেন বলিতে চাহিতেছিলেন। হয়তো আমার আদেশের অপেক্ষা করিতেছিলেন।

অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আমি বলিলাম, মহারাজ, আপনার যদি কিছু বলিবার থাকে বলিতে পারেন—আমি সব রকম শাস্তি লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি। আমার মুখ হইতে 'মহারাজ' কথাটি শুনিয়া রঘুনন্দন পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু পুলকের পূর্ণ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই তিনি বলিতে লাগিলেন, মহারাণী, আপনার নিকট শেষ বিদায় লইতে আসিয়াছি। আমি সৈন্য; যুদ্ধের ডাক আসিয়াছে। এমন সময় নাই যে প্রাণ খুলিয়া সব কথা বলিতে পারি। তথাপি অনুমতি পাইলে দুই চারিটি কথা বলিতে চাই। হয়তো আর ফিরিয়া আসিব না।

[আগামী বারে সমাপ্য]

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

বিদ্যাসাগর

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলিকাতার বাসায় বাহিরের বসিবার ঘর। ঘরে দুইটি দরজা, একটি ভিতরের দিকে, অপরটি বাহিরের দিকে। ঘরে আসবাবপত্র যাহা আছে তাহাতে ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন নাই বটে, কিন্তু নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা সেগুলিকে মর্য্যাদা দান করিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর খাতা রাখিয়া লিখিতেছেন, সম্মুখে একটি পুস্তক খোলা রহিয়াছে। দ্বারপ্রান্তে মতিলালকে দেখা গেল, ইনি বীরসিংহা-নিবাসী এবং পূর্ব্বদৃশ্যে উল্লিখিত স্বর্গীয় নিবারণের প্রতিবেশী

বিদ্যাসাগর। এস মতি। তারপর, হঠাৎ কি মনে ক'রে ?

মতিলাল। নিজের একটু দরকারে কলকাতায় এসেছি, তুমি কি নিবারণের মাকে মাসে মাসে পাঁচ টাকা ক'রে দেবে ব'লে এসেছ ?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ।

মতিলাল। তা হ'লে দাও, নিয়ে যাই।

বিদ্যাসাগর। ওদের খবর কি ?

মতিলাল। তুমি যদি সাহায্য না কর, সংসার চলবে না, নিবারণই তো যা কিছু রোজগার করত।

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন

বিদ্যাসাগর। আমার সবচেয়ে কষ্ট হয় ওই কচি বিধবাটার জন্যে। মাত্র ন দশ বছর বয়স।

মতিলাল। তার নিজের কিন্তু খুব বেশি কষ্ট হয় নি।

বিদ্যাসাগর। কি রকম ?

মতিলাল। সবাই জোর ক'রে তার সিঁদুর মুছে দিয়ে থান পরিয়ে দিয়েছে ব'লেই তাকে বিধবা ব'লে মনে হয়, আর কোন লক্ষণ নেই। একাদশীর দিন খালি একটু কাঁদে।

বিদ্যাসাগর। কেন ?

মতিলাল। খাবার জন্যে।

বিদ্যাসাগর। তাই নাকি ?

মতিলাল। [অন্যরূপ অর্থ বুঝিয়া] তবে আর বলছি কি, নির্জ্জলা একাদশী তো তাকে দিয়ে করানোই গেল না এ পর্য্যন্ত। ঠিক লুকিয়ে কিছু খাবেই, আর কিছু না পাক আঁজলা আঁজলা ক'রে জল খাবে পুকুরে গিয়ে। আজকালকার মেয়েদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা রকম, বোয়েছ ?

বিদ্যাসাগরের সমস্ত মুখমণ্ডল বেদনাতুর হইয়া উঠিল, তিনি কোন কথা বলিলেন না। মতিলাল বলিয়া চলিলেন

গেল একাদশীতে খুড়ীমা তাকে ঘরে তালাবন্ধ ক'রে রেখেছিলেন।

বিদ্যাসাগর। [সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে] তোমরা মানুষ, না পিশাচ ?

মতিলাল। [সবিস্ময়ে] তার মানে ?

বিদ্যাসাগর। ওইটুকু মেয়েকে জোর ক'রে একাদশী করাবার দরকার কি ?

মতিলাল। [আরও বিস্মিত] দরকার কি ! সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়ে এ কথা বলছ তুমি ?

বিদ্যাসাগর। সংস্কৃতের সম্বন্ধে তোমার ধারণা তো খুব নিখুঁত দেখছি !

টেবিলের ড্রয়ার টানিলেন

মতিলাল। বাঃ, আমাদের শাস্ত্রে—

বিদ্যাসাগর। তোমার সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করবার সময় নেই এখন আমার, এই নাও।

তাঁহাকে পাঁচ টাকা দিলেন

আর নিবারণের মাকে ব'লো, যেন একাদশীর দিন তাকে খেতে দেয়, ওই কচি মেয়েটাকে খেতে দিলে চণ্ডী অশুদ্ধ হবে না।

মতিলাল। [উঠিয়া] আচ্ছা, তাই ব'লে দেব, তোমার মতামত যে এ রকম তা আমার জানা ছিল না। আমরা মুখ্যু মানুষ, দেশাচার মেনেই চলি। আচ্ছা, চললুম—তাই ব'লে দেব।

চলিয়া গেলেন

বিদ্যাসাগর। দেশাচার!

পুনরায় লিখিতে সুরু করিলেন। একটু পরে দ্বারপ্রান্তে শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতিকে দেখা গেল। ইনি স্থবির এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বতন শিক্ষক। লাঠির উপর ভর দিয়া ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিদ্যাসাগর দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং আগাইয়া গিয়া প্রণাম করিলেন

বাচস্পতি। তোর কাছে একবার এলুম বাবা।

বিদ্যাসাগর। আসুন, বসুন।

চেয়ার আগাইয়া দিলেন, বাচস্পতি উপবেশন করিলেন, বিদ্যাসাগর দাঁড়াইয়া রহিলেন

বাচস্পতি। দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ব'স।

বিদ্যাসাগর চেয়ারে গিয়া বসিলেন, বাচস্পতি টেবিল হইতে খাতাখানা তুলিয়া লইয়া একটু দূরে ধরিয়া ভ্রূকুঞ্চন সহকারে পড়িবার চেষ্টা করিলেন

বাচস্পতি। কোন গ্রন্থ রচনা করছ নাকি?

বিদ্যাসাগর। আজ্ঞে না, ইংরেজী লেখা অভ্যাস করছি।

যেন কোন অস্পৃশ্য বস্তুর সংস্পর্শ ত্যাগ করিলেন, এমনই ভাবে বাচস্পতি খাতাখানি টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন

বাচস্পতি। ইংরেজী! কেন?

বিদ্যাসাগর। ভাষাটা শিখছি।

বাচস্পতি। সংস্কৃত ভাষায় এত বড় পণ্ডিত তুমি, তোমার ও ম্লেচ্ছভাষা শেখবার প্রয়োজনটা কি? [সাড়ম্বরে] বিদ্যার সাগর তুমি—

বাচস্পতির নিকট অন্য কোন যুক্তির অবতারণা বৃথা মনে করিয়া বিদ্যাসাগর একেবারে সার যুক্তিটি বিবৃত করিলেন

বিদ্যাসাগর। শিখছি চাকরির জন্যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে

সিভিলিয়ান সাহেবদের পড়াতে হয়, ইংরেজী না জানলে চলে না, হিন্দীও ঐ কারণেই শিখতে হচ্ছে।

বাচস্পতি যেন আশ্বস্ত হইলেন

বাচস্পতি। ও, চাকরির জন্যে, তবু ভাল। [ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া] হ্যাঁ, চাকরির জন্যে আজকাল লোকে না করছে কি? টুপি পরছে, পাৎলুন পরছে, বার্ডসাই খাচ্ছে, মদ খাচ্ছে, এমন কি খিরিষ্টান পর্য্যন্ত হয়ে যাচ্ছে। বেশ, শেখ।

কিছুক্ষণ চুপচাপ

বিদ্যাসাগর। আমার কাছে কি কোন দরকারে এসেছেন?

বাচস্পতি। দরকার—মানে—

বাচস্পতি একটু যেন বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। তাহার পর একটু সামলাইয়া লইলেন

দেখ ঈশ্বর, তোর রাগটিকে আমি বড় ভয় করি বাপু। অথচ সব কথা তোকে না ব'লেও থাকতে পারি না। তুই শুধু আমার ছাত্র ন'স, পুত্রস্থানীয়। রাগ করবি না বল।

বিদ্যাসাগর। কি বলুন?

বাচস্পতি। মানে, এ পাড়ায় আমার একজন আত্মীয়ের বাড়িতেই এসেছিলাম আমি, ভাবলাম, তোর সঙ্গেও একবার দেখাটা ক'রে যাই। তুইও তো দেখিস নি, তোকে জানাতে পর্য্যন্ত সাহস হয় নি আমার।

বিদ্যাসাগর। কি জানাতে সাহস হয় নি?

বাচস্পতি যেন মরিয়া হইয়া বলিয়া ফেলিলেন

বাচস্পতি। আমি আবার দারপরিগ্রহ করেছি। তোর কথা রক্ষে করতে পারলাম না বাবা। তুই তো গোঁয়ারের মত মানা ক'রে

দিয়ে চ'লে এলি, আমার দুঃখ-কষ্ট তো বুঝলি না। এই বুড়ো বয়সে পরিবার না থাকলে কে আমার দেখাশোনা করে বল ?

উভয়েই কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব রহিলেন

বিদ্যাসাগর। আমি তো বলেছিলাম, আপনি আমার কাছে এসে থাকুন, আমি আপনার দেখাশোনা করব।

বাচস্পতি। সেটা কি একটা কাজের কথা বাবা ? গৃহধর্ম্ম করতে হ'লে গৃহিণী চাই, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে, গার্হস্থ্য আশ্রম নিয়ে যখন আছি—

বিদ্যাসাগর গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বাচস্পতি থামিয়া গেলেন এবং একটু বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন

বিদ্যাসাগর। বেশ, যা ভাল বুঝেছেন, করেছেন। এখন আমার কাছে আপনার কি দরকার ?

বাচস্পতি। দরকার তেমন কিছু—[একটু ইতস্তত করিয়া] তোর মাকে প্রণাম করবি না ?

বিদ্যাসাগর। না, আমি আর আপনার ভিটে মাড়াব না।

বাচস্পতি অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু অপ্রতিভ ভাবটাকে চাপা দিবার জন্য ক্রোধের ভান করিলেন

বাচস্পতি। জানি জানি, সে আগে থাকতেই জানি আমি। ওই ম্লেচ্ছ ব্যাটাদের সংস্পর্শে এসে তোমার মেজাজ যে দিন দিন আরও সায়েবী হয়ে উঠছে, তা আগে থাকতেই অনুমান করেছিলাম আমি। যদিও গুরুপত্নীকে প্রণাম করতে শিষ্যেরই গুরুর বাড়িতে যাওয়া উচিত, কিন্তু তোমার গোঁ তো জানা আছে আমার, তাই সঙ্গে ক'রেই এনেছি—

বিদ্যাসাগর। [সবিস্ময়ে] কাকে সঙ্গে ক'রে এনেছেন ?

বাচস্পতি। তোর মাকে।

বিদ্যাসাগর দাঁড়াইয়া উঠিলেন

এই পাড়াতেই এক আত্মীয়ের বাড়িতে এসেছিলাম বললাম না, ভাবলাম—

বিদ্যাসাগর। [বাধা দিয়া] কোথায় তিনি ?

বাচস্পতি। [উঠিয়া দাঁড়াইয়া] বাইরে পালকিতে। ডেকে নিয়ে আসব, না দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিবি বাড়ির দরজা থেকে ?

বিদ্যাসাগর নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। বাচস্পতি তাঁহার প্রতি একটা রোষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন এবং ক্ষণপরেই একটি অবগুণ্ঠনবতী বালিকাকে লইয়া পুনঃ-প্রবেশ করিলেন। বিদ্যাসাগরের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর নিজেই তাহার গুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দিলেন

এই দেখ, এর নামই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—আমার ছাত্র, কীর্ত্তিমান ছাত্র।

মেয়েটির বয়স দশ এগারো বৎসরের বেশি নয়। ফুটফুটে সুন্দরী। বিদ্যাসাগর বিস্ফারিত নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া ছিলেন। আত্মবিস্মৃত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন।

বিদ্যাসাগর। ঘাটের মড়া আপনি, একে বিয়ে করেছেন! ওর মুখ দেখে দয়া হ'ল না আপনার, এতটুকু দয়া হ'ল না ?

বাচস্পতি। দয়া করেছি বইকি। ওর বাপ একটি পয়সা কৌলিন্য-মর্য্যাদা দেয় নি আমাকে। হরিতকী মাত্র নিয়ে—

বিদ্যাসাগরের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল

বিদ্যাসাগর। [প্রায় চীৎকার করিয়া] আপনার চিতার আগুনের হলকায় এমন সুন্দর ফুলটিকে ঝলসে ফেলবার কি অধিকার আছে আপনার, বলতে পারেন ?

মেয়েটি অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল

বাচস্পতি। অত কথায় কাজ কি, তোর ওই চটি জুতো খুলে ঘা কতক

বসিয়ে দে আমার পিঠে। চল গো, আমরা যাই। তুই এমন ব্যাভার করলি শেষটা ?

গমনোদ্যত

বিদ্যাসাগর। দাঁড়ান।

বাচস্পতি-দম্পতি দাঁড়াইয়া পড়িলেন। বিদ্যাসাগর টেবিলের ড্রয়ার হইতে গোটা দুই টাকা বাহির করিয়া আগাইয়া গেলেন এবং টাকা দুইটি বধূটির পায়ের নিকট রাখিয়া প্রণাম করিলেন

বাচস্পতি। নাও, টাকা দুটো তুলে নাও, চল।

বধূ হেঁট হইয়া টাকা দুইটি তুলিয়া লইল

বিদ্যাসাগর। [অবরুদ্ধ কণ্ঠে] উঃ, আপনি যদি আমার গুরু না হতেন, তা হ'লে আজ—

বাচস্পতি। তা হ'লে কি করতিস ?

বিদ্যাসাগর। তা হ'লে—[সহসা] দেখুন—

গুরোরপব্যলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ
উৎপথ—প্রতিপন্নস্য ন্যায্যং ভবতি শাসনং।

আপনি—আপনার মুখদর্শন করব না আর।

বাচস্পতি। [সক্রোধে] কি, এত বড় স্পর্দ্ধা তোর ? অর্ব্বাচীন, বেল্লিক—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা !

গালি দিতে দিতে পত্নীসহ বাচস্পতি নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর চেয়ারে গিয়া বসিলেন

বিদ্যাসাগর। [সক্ষোভে] হতভাগা দেশ !

দ্বারপ্রান্তে একটি দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ উনিশ-কুড়ি বছরের যুবক আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। অল্প অল্প গোঁফ-দাড়ি উঠিয়াছে, মুখে চোখে সংযত শান্ত শ্রী

ভূদেব যে, এস এস, তারপর কি মনে ক'রে ?

ভূদেব প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিলেন

ভূদেব। [স্মিত মুখে] দেশের ওপর যে ভারী চটেছেন দেখছি।

বিদ্যাসাগর। যে দেশে কুমারীরা কচি বুড়ো যে কোন বয়সের যে কোন লক্ষ্মীছাড়ার গলায় মালা দিয়ে কুল মান চোদ্দপুরুষ রক্ষে করে, সে দেশ নিয়ে গদগদ হয়ে ওঠবার কোন কারণ দেখতে পাই না।

ভূদেব। সব দেশেই অমন দু চারটে কু-প্রথা আছে। বিলেতে—

বিদ্যাসাগর। দেখ, ওটা কোন সান্ত্বনা নয়।

ভূদেব অপ্রতিভ হইলেন

ভূদেব। না, আমি তা বলছি না।

বিদ্যাসাগর। হঠাৎ কি মনে ক'রে এখন ?

ভূদেব। আমি এসেছি মধুর জন্যে।

বিদ্যাসাগর। মধু কে ?

ভূদেব। মধু ব'লে আমাদের সঙ্গে একটি ছেলে পড়ে, আপনি চেনেন তো তাকে, খুব ভাল কবিতা লিখতে পারে।

বিদ্যাসাগর। মনে পড়েছে। যে ছোকরা কলেজে এসে তিনবার স্যুট বদলায়, সেই কি ?

ভূদেব। [হাসিয়া] হ্যাঁ, সেই।

বিদ্যাসাগর। কি হয়েছে তার ?

ভূদেব। সে ক্রিশ্চান হচ্ছে।

বিদ্যাসাগর। তা তো হবেই। এ হতভাগা সমাজে ভাল লোক টিকতে পারে কখনও ?

ভূদেব। কেন, আমাদের সমাজে ভাল কিছু নেই ?

বিদ্যাসাগর। ভাল থাকলে সমাজ ছেড়ে লোকে পালাবে কেন ? কোন্ জিনিসটা ভাল আছে, শুনি ?

ভূদেব। [একটু ইতস্তত করিয়া] আর কিছু না থাক, আমাদের

ইতিহাসে বিরাট অতীত আছে, আমাদের কাব্যে মহৎ আদর্শ আছে, আমাদের শাস্ত্রে বহুদর্শিতার নিদর্শন আছে।

বিদ্যাসাগর। আছে আছে বলছ কেন, ছিল ছিল বল। এখন দলাদলি আছে, খেউড় আছে, হাফ-আখড়াই আছে, বেশ্যার নাচ আছে, রসরাজ আছে।

ভূদেব। আপনি খারাপ দিকটাই দেখছেন খালি। রসরাজের নাম করলেন, কিন্তু তত্ত্ববোধিনীও তো আছে, বেঙ্গল স্পেক্‌টেটার আছে।

বিদ্যাসাগর। কিন্তু ওদের গালাগালি দিতে দিতে যে এদেশের লোকের মুখে ফেকো উড়ে গেল! যে রামমোহন রায়কে পূজো করা উচিত, তাকে তোমরা দেশছাড়া করেছিলে, বিলেতে গিয়ে মৃত্যু হ'ল তাঁর।

ভূদেব। [বিনীত প্রতিবাদের হাসি হাসিয়া] না না, তিনি তো বিলেত গিয়েছিলেন বাদশার পেন্‌শনের ব্যাপার নিয়ে—

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ, ইতিহাসে ওই কথাই লেখা থাকবে। আসলে কিন্তু তিনি পালিয়েছিলেন তোমাদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে।

ভূদেব চুপ করিয়া রহিলেন

দেখ, এ দেশকে যদি বাঁচাতে চাও, তা হ'লে এর গুণকীর্ত্তন না ক'রে ময়লা পরিষ্কার কর আগে। এ দেশের সৌভাগ্য যে ইংরেজ এদেশে এসেছে।

ভূদেব। সবই জানি, তবু কিন্তু আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। আমরা সবাই অসভ্য বর্ব্বর, ইংরেজদের দয়াতে সভ্য হচ্ছি—এ কথা স্বীকার করতে লজ্জায় মাথা কাটা যায় আমার। আমি হয়তো এখন যুক্তি দিয়ে ঠিক বোঝাতে পারব না আপনাকে, কিন্তু—

গলার স্বর ভারী হইয়া আসিল, অভিভূত হইয়া তিনি থামিয়া গেলেন

বিদ্যাসাগর। [সবিস্ময়ে] ও বাবা, তুমি যে আমার চেয়েও বেশি ছিঁচকাঁদুনে দেখছি। ব'স ব'স, ওসব তর্কাতর্কি থাক।

ভূদেব দাঁড়াইয়া ছিলেন, বিদ্যাসাগর একরূপ জোর করিয়া তাঁহাকে একটা চেয়ারে বসাইয়া দিলেন এবং নিজে মেঝের উপর উবু হইয়া বসিয়া তক্তাপোশের তলা হইতে কি যেন বাহির করিতে লাগিলেন। উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখা গেল একটা চকচকে কাঁসার রেকাবিতে গোটা কয়েক সন্দেশ তিনি বাহির করিয়াছেন

নাও, একটু মিষ্টিমুখ কর।

ভূদেব। না থাক, আমি এখন খাব না।

বিদ্যাসাগর। বেজায় চটেছ দেখছি! বেশ বেশ, আমাদের সমাজ খুব ভাল, প্রত্যেকটি লোক দেব-চরিত্র—নাও, খাও।

ভূদেব। [হাসিয়া] না, সেজন্যে নয়, আমি এখনও সন্ধ্যাহ্নিক করি নি।

বিদ্যাসাগর। বল কি, তুমি আবার সন্ধ্যাহ্নিক কর নাকি? ডিরোজিও কোম্পানির ছোঁয়াচ তোমাকে লাগে নি তা হ'লে বল। অ্যাঁ, অবাক করলে যে!

ভূদেব হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। বিদ্যাসাগর সন্দেশ যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন

মধু ক্রিশ্চান হচ্ছে, তা আমি কি করব বল?

ভূদেব। আমি রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের কাছে গেসলাম, শুনলাম তিনি আপনার কাছেই আসবেন।

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ, তার আসবার কথা আছে এখনই। 'সর্ব্বার্থ সংগ্রহে'র জন্যে আসবে।

ভূদেব। আপনি যদি একটু বলেন তাঁকে, তা হ'লে হয়তো—

বিদ্যাসাগর। তুমি নিজে ব'লো বাবু। ও এক অদ্ভুত মানুষ, কথায় কথায় ভট্টি আওড়ায়, অথচ পাদরিগিরি ক'রে বেড়ায়, বুঝি না ওকে।

ভূদেব। আচ্ছা, তা হ'লে ঘুরে আসি আমি।

বিদ্যাসাগর। এস।

ভূদেব চলিয়া গেলেন। দুর্গাচরণ ও রাজকৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন, দুর্গাচরণের হাতে একটি পুঁটুলি

বিদ্যাসাগর। তোমরা আমাকে আজ আর লিখতে দেবে না দেখছি। দুর্গাচরণ, তোমার হাতে ওটা কি ?

রাজকৃষ্ণ একটি চেয়ারে বসিলেন

দুর্গাচরণ। এ বেলা তোমারই রাঁধবার পালা তো ?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ।

দুর্গাচরণ। কিছু বেগুন আর কুঁচো চিংড়ি নিয়ে এলুম, বেশ ঝাল ঝাল ক'রে রাঁধ দেখি, খাওয়া যাক। বেড়ে ওতরায় তরকারিটা তোমার হাতে।

বিদ্যাসাগর। আজ রাত হবে কিন্তু। রেভারেণ্ড কেষ্ট বাঁড়ুজ্জে আসছে, কতক্ষণ থাকবে জানি না।

দুর্গাচরণ। ও বাবা! আমি এগুলো শ্রীরামের জিম্মায় দিয়ে স'রে পড়ি তা হ'লে এখন। ঘণ্টা দুই পরে আসব।

মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেলেন। রাজকৃষ্ণ পকেট হইতে একটি চকচকে পানের ডিবা বাহির করিয়া তাহার ভিতর হইতে এক খিলি পান বাহির করিলেন। পানের খিলিটি দিয়া পুষ্ট গোঁফ জোড়াটি বাগাইলেন, তাহার পর সেটি মুখে ফেলিয়া দিলেন। তাঁহাকে বেশ একটু অন্যমনস্ক মনে হইল

বিদ্যাসাগর। একাই খেলে যে!

রাজকৃষ্ণ। ও, হ্যাঁ।

বিদ্যাসাগরকে পান দিলেন

বিদ্যাসাগর। তোমাকে অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে আজ।

রাজকৃষ্ণ। ঠিক ধরেছ।

আর এক খিলি পান খাইলেন

বিদ্যাসাগর। কি, ব্যাপার কি ?

রাজকৃষ্ণ। ব্যাপার গুরুতর।

বিদ্যাসাগর। কি ?

রাজকৃষ্ণ। কথাটা হচ্ছে—

ভৃত্য শ্রীরাম প্রবেশ করিল

শ্রীরাম। দুর্গাবাবু মাছ দিয়ে গেলেন, আঁচ দেব ?

বিদ্যাসাগর। একটু পরে, কাল ছুটি আছে তো।

শ্রীরাম। ছেলেগুলো সব ঘুমিয়ে পড়ল যে, কত রাত করবে আর ?

হাই তুলিল

বিদ্যাসাগর। তুইও একটু ঘুমিয়ে নে না।

শ্রীরাম। আমার এক ঘুম হয়ে গেল।

বিদ্যাসাগর। তবে চুপ ক'রে ব'সে থাকগে যা, যাচ্ছি।

শ্রীরাম। বসবার কি জো আছে, যা মশা!

বিদ্যাসাগর। আয় তবে, এই চেয়ারে ব'সে টেবিলে পা তুলে দে, আমি বাতাস করি তোকে।

শ্রীরাম নির্ব্বিকার

শ্রীরাম। বেশি রাত ক'র না, এস, মাছটা প'চে যাবে।

চলিয়া গেল

বিদ্যাসাগর। এইবার বল।

রাজকৃষ্ণ। ভারী মুশকিলে পড়েছি ভাই, এক বিধবা এসে জুটেছে আমাদের গাঁ থেকে।

বিদ্যাসাগর। কি রকম ?

রাজকৃষ্ণ। আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয় হয়, এসেছে কালীঘাটে তীর্থ করতে।

বিদ্যাসাগর। তাতে আর মুশকিলটা কি ?

রাজকৃষ্ণ। না, ভেতরে কথা আছে। [ডিবা বাহির করিয়া আর এক খিলি মুখে নিক্ষেপ করিলেন] নেবে ?

বিদ্যাসাগর। না।

রাজকৃষ্ণ। মেয়েটি বাল-বিধবা। যখন ও দশ বছরের, সেই সময় বিধবা হয়। এখন বয়স হবে উনিশ কুড়ি এবং—

বিদ্যাসাগর। এবং ?

রাজকৃষ্ণ। এখন সে অন্তঃসত্ত্বা।

বিদ্যাসাগর। অন্তঃসত্ত্বা! বল কি ?

রাজকৃষ্ণ। হ্যাঁ। কি করা যায় বল দিকি ?

বিদ্যাসাগর কোন উত্তর দিলেন না, নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন

আমার যতদূর মনে হচ্ছে, বুঝলে, কালীঘাটে আসার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়—

বিদ্যাসাগর এমন গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রাজকৃষ্ণ থামিয়া গেলেন

বিদ্যাসাগর। [সহসা] শ্রীরাম, শ্রীরাম!

শ্রীরাম প্রবেশ করিল

শ্রীরাম। কি বলছ ?

বিদ্যাসাগর। তুই তো পরশু বীরসিংহা থেকে ফিরেছিস, সুরো কেমন আছে ?

শ্রীরাম। কোন্ সুরো ?

বিদ্যাসাগর। আমাদের পাড়ার সুরো।

শ্রীরাম। সে তো ভালই আছে।

বিদ্যাসাগর। দেখে এসেছিস ?

শ্রীরাম। হ্যাঁ, শচী-বামনি থেকে জল নিয়ে আসছে দেখলাম।

বিদ্যাসাগর। আচ্ছা, যা।

শ্রীরাম চলিয়া গেল। বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন

রাজকৃষ্ণ। সুরো কে ?

বিদ্যাসাগর। সুরো আমার বাল্যসঙ্গিনী। [একটু পরে] সেও বাল-বিধবা।

রাজকৃষ্ণ। [ক্ষণকাল পরে] সেবার পরেশদের গ্রামে একটি বিধবা মেয়ে মারাই গেল।

বিদ্যাসাগর। কেন ?

রাজকৃষ্ণ। কেন আর—ভ্রূণহত্যা।

বগলে ফাইল পাদরি-বেশী রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনকে দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল

কৃষ্ণমোহন। May I come in ?

বিদ্যাসাগর। এস, এস।

কৃষ্ণমোহন। Good evening—তারপর খবর সব ভাল ? অনেক দিন আসতে পাই নি।

টুপি ও ফাইল টেবিলে রাখিয়া অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার রাজকৃষ্ণের ও একবার বিদ্যাসাগরের মুখের পানে চাহিলেন

I hope I haven't stumbled into your privacy, Pundit.

বিদ্যাসাগর। বাংলা ক'রেই বল, ইংরিজীটা এখনও রপ্তো হয় নি তেমন আমার।

কৃষ্ণমোহন। I am sorry. I mean আমি এসে তোমাদের গোপন কোন পরামর্শে বাধা দিলাম না তো ?

আবার উভয়ের মুখের দিকে চাহিলেন

বিদ্যাসাগর। কিছুমাত্র না। তা ছাড়া এসব জিনিস কত আর গোপন থাকবে, বল? প্রায় প্রতি ঘরে ঘরেই হচ্ছে।

কৃষ্ণমোহনের চক্ষুর্দ্বয় বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল

কৃষ্ণমোহন। Is it?

বিদ্যাসাগর। রাজু, এঁকে বলব সব কথা? আমার মনে হয়, বলাই ভাল। ইনি শেষ কথাটা শুনেছেন, সবটা না শুনলে হয়তো অন্য রকম ভাববেন।

রাজকৃষ্ণ। [অনিচ্ছাসত্ত্বেও] বল।

বিদ্যাসাগর। এঁর বাসায় এঁর দূরসম্পর্কীয়া এক আত্মীয়া কালীঘাটে তীর্থ করবার জন্যে এসেছেন। মেয়েটি বাল-বিধবা, এখন বয়স উনিশ কুড়ি, এবং ইনি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন তিনি অন্তঃসত্ত্বা।

কৃষ্ণমোহন ভ্রূযুগল উত্তোলন করিলেন

কৃষ্ণমোহন। অর্থাৎ কালীঘাটে শুধু পারলৌকিক উদ্দেশ্যেই আসেন নি, ইহলৌকিক মতলবও আছে কিছু। Well—

Shrug করিলেন। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সহসা কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইলেন

আগে কাজটা সেরে নিই, তারপর বিধবা নিয়ে মাথা ঘামানো যাবে। 'সর্ব্বার্থ সংগ্রহে'র জন্যে কিছু যোগাড় করেছ নাকি মালমসলা?

বিদ্যাসাগর। কিছু কিছু করেছি।

কৃষ্ণমোহন। কই, দেখি।

বিদ্যাসাগর শেল্‌ফে খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু যাহা খুঁজিতেছিলেন, তাহা পাইলেন না

বিদ্যাসাগর। দীনু, অ দীনু!

অনুজ দীনবন্ধু প্রবেশ করিলেন

দীনবন্ধু। কি বলছেন?

বিদ্যাসাগর। এখানে যে একখানা খাতা ছিল, কি হ'ল?

দীনবন্ধু। দুপুরে তর্কালঙ্কার মশাই এসেছিলেন, তিনিই নিয়ে গেছেন।

বিদ্যাসাগর। কে, মদন?

দীনবন্ধু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিদ্যাসাগর। যা নিয়ে আয় গিয়ে, কি করছিস তুই এখন?

দীনবন্ধু। পড়ছি।

কৃষ্ণমোহন। থাক, ওকে আর যেতে হবে না পড়ার ক্ষতি ক'রে, আমিই যাবার সময় নিয়ে যাব এখন। যাও তুমি। ওটা কি, তত্ত্ববোধিনী নাকি?

দীনবন্ধু চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণমোহন তত্ত্ববোধিনী উলটাইতে লাগিলেন

রাজকৃষ্ণ। একটা কথা বলতে ভুলেছি তোমাকে, শ্রীশ এসেছে, এখুনি আসবে তোমার কাছে।

বিদ্যাসাগর। কেন?

রাজকৃষ্ণ। কি জানি, তার এক দূরসম্পর্কের বিধবা ভগ্নীকে নিয়ে কি এক হাঙ্গামা হয়েছে, তাই নিয়ে ও দরখাস্ত করবে। ঠিক মনে নেই সব আমার, আসবে সে।

ভৃত্যজাতীয় এক ব্যক্তি হন্তদন্ত হইয়া প্রবেশ করিল

ভৃত্য। আমাদের বাবু এয়েছে এখেনে? [রাজকৃষ্ণকে দেখিয়া] এই যে।

রাজকৃষ্ণ। কি?

ভৃত্য। যে মাঠানটি তিথথি করতে এয়েছে, তিনি তো কান্নাকাটি ক'রে অনথ করছে বাবু। আমাদের মাঠান তেনাকে কি যেন বলেছে, তিনি তো কানতে কানতে আস্তায় বেইরে যাচ্ছিল, আমি আর গুপি আটক করেছি, এস একবারটি—

সকলেই স্তম্ভিত

বিদ্যাসাগর। যাও, তুমি যাও।

ভৃত্যসহ রাজকৃষ্ণের প্রস্থান

কৃষ্ণমোহন। [shrug করিয়া] There you are. The ball has been set rolling.

বিদ্যাসাগর। [বিচলিতভাবে] কি উপায় করা যায় ?

কৃষ্ণমোহন। তোমাদের সমাজে এর তিনটি উপায় আছে—abortion, prostitution or both—চতুর্থ কোন উপায় নেই। আচ্ছা, আমি উঠি এবার। মদনকে বাড়িতেই পাব তো ?

বিদ্যাসাগর। খুব সম্ভব।

ভূদেব আসিয়া প্রবেশ করিলেন

কৃষ্ণমোহন। Hallo, is it Bhudeb ?

ভূদেব নমস্কার করিলেন

Good evening. What brings you here ?

ভূদেব। আপনার কাছে একটু দরকার আছে।

কৃষ্ণমোহন। I am always at your service. কি করতে হবে বল ?

শ্রীরাম আসিয়া দ্বারপ্রান্তে উঁকি দিল

বিদ্যাসাগর। তোমরা কথা কও, আমি রান্নার ব্যবস্থাটা ক'রে আসছি এখুনি।

চলিয়া গেলেন

কৃষ্ণমোহন। Well, what can I do for you ?

ভূদেব। মধুকে আপনারা নাকি ক্রিশ্চান করছেন ?

কৃষ্ণমোহন। আমরা ! What do you mean ? I have nothing to do with it personally.

ভূদেব। [একটু ইতস্তত করিয়া] শুনেছি, মধু আপনার মেয়েকে নাকি বিয়ে করতে চায়।

কৃষ্ণমোহন। So have I. তুমিও যেমন শুনেছ, আমিও তেমনই শুনেছি।

ভূদেব। [যেন নিশ্চিন্ত হইলেন] ও, তা হ'লে গুজবটার কোন ভিত্তি নেই।

কৃষ্ণমোহন। Well, being a desciple of Henry Louis Vivian Derozio of revered memory I shall not twist facts. কিছু ভিত্তি আছে বইকি।

ভূদেব সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন

Well, the fact is—Madhu has been a bit foolish about her lately.

ভূদেব। Foolish ? তার মানে ?

কৃষ্ণমোহন। Foolishness ছাড়া আর কি বলব ? My daughter is just a slip of a girl ; কিন্তু তোমার বন্ধুটি তার কাছে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শেক্‌স্‌পিয়ার, মিল্‌টন, হোমার, ভার্জিল আউড়ে চলেছে।

Shrug করিয়া এবং হাত উল্টাইয়া

Well, that's where it exactly stands.

ভূদেব। কিন্তু এমনভাবে মেশামেশি করতে দেওয়ার মানেই তো—

কৃষ্ণমোহন। [সবিস্ময়ে] How can I help it ? বাড়িতে মেয়ে থাকলেই suitor আসবে। There are other suitors too. [সহসা] হিন্দু কলেজের ছাত্র হয়ে তোমার এমন শুচিবাই কেন বল তো ?

ভূদেব। [সহাস্যে] হিন্দু কলেজের ছাত্রের হিন্দুই তো হওয়া উচিত।

কৃষ্ণমোহন। I see. [ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া] হিন্দুর ডেফিনিশন কি? শাক্ত, বৈষ্ণব, বামাচারী, ব্রহ্মচারী, নেড়ামাথা, জটাওলা, পৌত্তলিক, বৈদান্তিক সবাই হিন্দু, এমন কি নাস্তিক পর্য্যন্ত।

ভূদেব। হিন্দুধর্ম্ম উদার এবং প্রশস্ত, তাই সকলেরই স্থান আছে ওতে।

কৃষ্ণমোহন। ও, তাই বুঝি মুসলমানকে ছুঁলে গঙ্গা নাইতে হয় আর গির্জায় গেলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়!

ভূদেব। [সসম্ভ্রমে] আপনার সঙ্গে তর্ক করবার স্পর্দ্ধা আমার নেই। আপনি কি সত্যিই খ্রীষ্টধর্ম্ম মহত্তর মনে ক'রেই খ্রীষ্টান হয়েছিলেন?

কৃষ্ণমোহন। Oh, no. I was forced into it. গোমাংস আর মদ খেয়েছিলাম ব'লে হিন্দুসমাজ আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

ভূদেব। কিন্তু মদ আর গোমাংস খাওয়াটা কি ভাল?

কৃষ্ণমোহন। Why not?

ভূদেব। মদ খেলে শুনেছি লিভার খারাপ হয়।

কৃষ্ণমোহন। লঙ্কা খেলেও হয়। [একটু থামিয়া] আলো চাল খেলেও হয়। আমার এক পিসীমা জীবনে হবিষ্যান্ন ছাড়া অন্য কোন জিনিস স্পর্শ করেন নি, তিনি সিরোসিস অব লিভারে মারা গেছেন। আর আমাদের মিশনে যদি আস, এক গোখাদক বুড়ী মেমসায়েবকে দেখিয়ে দেব, তার সঙ্গে আমি পর্য্যন্ত হেঁটে পাল্লা দিতে পারি না। তার লিভার ঠিক আছে।

ভূদেব। [হাসিয়া] সায়েবদের ধাতে যেটা সয়, আমাদের ধাতে সেটা না-ও সইতে পারে তো?

কৃষ্ণমোহন। হিন্দু মুনি-ঋষিদের ধাতে কিন্তু সইত। যজ্ঞাগ্নিতে beef roast ক'রে খেতেন তাঁরা। ঋগ্বেদে সোমরসের যে রকম বর্ণনা আছে, তাতে হুইস্কি-শ্যাম্পেনকে ছেলেমানুষ ব'লে মনে হয় তার কাছে। সমগ্র নবম মণ্ডলটিতে সোমরস ছাড়া আর কোন রস নেই।

ভূদেব। [সাগ্রহে] বেদ আপনি পড়েছেন? এখানে কোন্ লাইব্রেরিতে আছে বলুন তো?

কৃষ্ণমোহন। আমি পড়েছি জার্মান অনুবাদ। আমার কাছেই আছে। There you are again,—হিন্দুদের বেদ হিন্দুদের কাছ থেকে পাবার জো নেই, পেতে হচ্ছে খ্রীষ্টান জার্মানদের মারফৎ এবং তাদের জবানিতে।

উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আলতো আলতো ভাবে ভূদেবের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন

Don't hate the Christians, my boy. They are well-meaning people. They have done a lot of good to your country.

ভূদেব। [সসঙ্কোচে] সবই স্বীকার করছি, কিন্তু আমার কেমন যেন—

কৃষ্ণমোহন। [বলিয়া চলিলেন] কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড, ডেবিড হেয়ার, ডিরোজিও, শের্বর্ন, ড্রমণ্ড—এঁরা এদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার না করলে আমাদের অবস্থা যে কি হ'ত, তা ভাবলেও ভয় হয় [শিহরিয়া উঠিলেন]। Look at Mr. Bethune, look at our Governor, come, don't be a prig.

ভূদেব। কিন্তু টাইট্‌লার সাহেব তো শুনেছি প্রাচ্য ভাষায় শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলতেন, সংস্কৃত—

কৃষ্ণমোহন। [অধীরভাবে] Oh, don't talk of Tytler. সে নিউটন ছাড়া আর কিছু বুঝত না, আর আমাদের রাধানাথ ছাড়া

আর কারও সঙ্গে তার বনত না। He was a queer fish, ছাগলের গাড়ি চ'ড়ে গড়ের মাঠে বেড়িয়ে বেড়াত।

ভূদেব। [নাছোড়] কিন্তু তিনি সায়েব হয়েও তো সংস্কৃত ভালবাসতেন।

কৃষ্ণমোহন। আমিও কি সংস্কৃত কম ভালবাসি? কিন্তু দই ভালবাসি ব'লে পুডিং খেতে পাব না—এ কি রকম আবদার তোমাদের?

ভূদেব। [হাসিয়া] কিন্তু তবু আমার মনে হয়, আপনি যদি হিন্দুই থাকতেন, তা হ'লে—

কৃষ্ণমোহন। তা হ'লে কি?

ভূদেব। তা হ'লে আরও যেন বেশি তৃপ্তি হ'ত আমার।

কৃষ্ণমোহন অকৃত্রিম আনন্দের ভান করিয়া অতিশয় কৃত্রিম একটা হাসি হো হো করিয়া হাসিলেন

কৃষ্ণমোহন। তোমাদের সমাজ আমাকে তাড়িয়ে দিলে আমি কি করব বল?

ভূদেব। মধু যাতে ক্রিশ্চান না হয়, তার ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে কিন্তু।

কৃষ্ণমোহন। [গম্ভীরভাবে] That is impossible, my boy.

ভূদেব। ইচ্ছে করলে আপনি নিশ্চয়ই পারেন।

কৃষ্ণমোহন। ও রকম ইচ্ছে করাই আমার সাধ্যাতীত। আমি যদিও ইচ্ছে ক'রে ক্রিশ্চান হই নি, কিন্তু ক্রিশ্চান হয়ে ক্রিশ্চ্যানিটির মর্ম বুঝেছি।

ভূদেব। আপনি তা হ'লে মধুর জন্যে কিছু করবেন না?

কৃষ্ণমোহন। Please excuse me.

ভূদেব ক্ষণকাল নীরব রহিলেন

ভূদেব। আচ্ছা, তা হ'লে যাই আমি, নমস্কার।

কৃষ্ণমোহন। Good night.

বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন

ভূদেব। আমি চললাম।

কৃষ্ণমোহন। আমিও। Good night, Pundit.

উভয়ে চলিয়া গেলেন। শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন আসিয়া প্রবেশ করিলেন

বিদ্যাসাগর। এস, তারপর কি মনে করে?

শ্রীশ। আমি একটা বিপদে প'ড়ে তোমার কাছে এসেছি ভাই, একটু সাহায্য করতে হবে।

বিদ্যাসাগর। কি করতে হবে বল?

শ্রীশ। আমার এক দূরসম্পর্কের ভাগনী বিধবা হয়েছে, দশ বছর মাত্র তার বয়স। কিন্তু তার শ্বশুর-বাড়ির লোকেরা এমন চণ্ডাল, যে, কিছুতে তাকে বাপের বাড়ি আসতে দেবে না।

বিদ্যাসাগর। কেন?

শ্রীশ। কেন বুঝতে পারছ না, পেট-ভাতায় একটি ঝি পেলে কেউ ছাড়ে কখনও?

ক্ষণকাল নীরবতা

বিদ্যাসাগর। আমাকে কি করতে হবে?

শ্রীশ। ওখানকার যিনি ম্যাজিস্ট্রেট তিনি তোমার ছাত্র, আমি একটা দরখাস্ত লিখে এনেছি, তুমি যদি একটু সুপারিশ ক'রে দাও, বড় ভাল হয়।

বিদ্যাসাগর। আত্মীয়ের নামে নালিশ করবে?

শ্রীশ। তা ছাড়া উপায় কি, অনেক অনুরোধ উপরোধ করা হয়েছে।

বিদ্যাসাগর। কিন্তু মেয়েটার তাতে কি লাভ হবে?

শ্রীশ। লাভ আর কি, ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে আসবে, ওদের ওখানে দাসীবৃত্তি করছে বই তো নয়।

বিদ্যাসাগর। কিন্তু বাপের বাড়িতেও তো সেই দাসীবৃত্তি। চরিত্রও খারাপ হতে পারে। তার চেয়ে এক কাজ কর—

শ্রীশ। মস্তর নেবার কথা বলছ ?

বিদ্যাসাগর। বিয়ে দাও।

শ্রীশ। বিয়ে !

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ।

শ্রীশ বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন, ক্ষণকাল পরে তাঁহার বাক্যস্ফূর্তি হইল

শ্রীশ। বল কি !

বিদ্যাসাগর। চমকাচ্ছ কেন, প্রস্তাবটা যুক্তিযুক্ত নয় ?

শ্রীশ। [আরও চমকিত] বিধবা-বিবাহ যুক্তিযুক্ত !

বিদ্যাসাগর। ক্ষুধিতকে যদি খেতে না দাও, সে চুরি ক'রে খাবে, অখাদ্য কুখাদ্য খাবে—এ তো সহজ যুক্তি।

শ্রীশ। শাস্ত্রে কিন্তু ক্ষুধা দমন করবার উপদেশ দিয়েছে।

বিদ্যাসাগর। উপদেশ দেওয়াটা অতি সোজা, পালন করাটাই শক্ত।

শ্রীশ। হিন্দু বিধবার পবিত্র উচ্চ আদর্শ তুমি মান না ?

বিদ্যাসাগর। মানি। কিন্তু ওই পবিত্র উচ্চ আদর্শটি এত বেশি উচ্চ যে, সকলে তার নাগাল পায় না। যারা পায় না, তাদের আবার বিয়ে করবার সুযোগ দেওয়া উচিত।

শ্রীশ। কিন্তু তুমি উচিত বললেই তো লোকে মানবে না। শাস্ত্রে তার সমর্থন থাকা চাই।

বিদ্যাসাগর। শাস্ত্রে যা যা আছে সব মান তুমি ? শাস্ত্রে ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধান আছে, দেবরকে বিবাহ করবার বিধান আছে, গান্ধর্ব্ব

বিবাহের সমর্থন আছে, অহল্যা আছে, দ্রৌপদী আছে, কুন্তী আছে, হিড়িম্বা আছে, শকুন্তলা আছে, রাধাকৃষ্ণ আছে—এদের যে কোন একটার আদর্শ বরদাস্ত করতে পার তুমি ?

শ্রীশ। তুমি আমাদের শাস্ত্রের কতটুকু বোঝ ?

বিদ্যাসাগর। কিছুই বুঝি না, যা আছে তাই শুধু বললাম।

শ্রীশ। অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, রাধা এসবের যে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ—

বিদ্যাসাগর। দেখ, তোমাদের একটা ভারী মজার ব্যাপার দেখি। সংস্কৃতে কিছু লেখা থাকলেই তোমরা তার মধ্যে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ খুঁজে পাও, কিন্তু বাংলাতে সেই কথা বললেই আঁতকে ওঠ।

শ্রীশ। না, তা আমি অন্তত স্বীকার করতে রাজি নই। আমাদের শাস্ত্রে এমন কিছু নেই, যার বাংলা শুনে আমি আঁতকে উঠব।

বিদ্যাসাগর। দেখ, শাস্ত্র তোমরা কেউ পড় নি। পদিপিসী, কথক ঠাকুর আর পাঁজি—এই তিনটি তোমাদের সম্বল।

শ্রীশ। এ কথা বললে আর তোমার সঙ্গে তর্ক করা চলে না। কারণ—

বিদ্যাসাগর। [সহসা] হিন্দুশাস্ত্র মান তুমি ?

শ্রীশ। নিশ্চয়ই মানি।

বিদ্যাসাগর। হিন্দুশাস্ত্রে যদি বিধবা-বিবাহের বিধান থাকে, ভাগনীর বিয়ে দিতে রাজি আছ ?

শ্রীশ। হিন্দুশাস্ত্রে ওরকম বিধান থাকতেই পারে না।

বিদ্যাসাগর উঠিয়া শেল্‌ফের নিকটে গেলেন ও বই নাড়াচাড়া করিয়া ফিরিয়া আসিলেন

বিদ্যাসাগর। বইটা এখানে নেই, থাকলে তোমায় দেখিয়ে দিতাম যে, সংস্কৃত ভাষাতেই বিধবা-বিবাহের বিধান দেওয়া আছে।

শ্রীশ। নিজের চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাস করি না।

বিদ্যাসাগর। আর একদিন এস, নিজের চোখেই দেখতে পাবে, বইখানা এনে রাখব।

শ্রীশ। দরখাস্তটায় কিছু লিখে দাও এখন।

বিদ্যাসাগর। এখন লিখে দিলে কাল আর তুমি আসবে কি! কাল এস, বইটা এনে রাখব।

চিঠি লইয়া একজন পিওন প্রবেশ করিল এবং চিঠিখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দিয়া চলিয়া গেল। বিদ্যাসাগর পত্রখানি পড়িয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন

বিদ্যাসাগর। কালনা যেতে হবে।

শ্রীশ। কালনা! কেন?

বিদ্যাসাগর। একটা জরুরি দরকার আছে।

শ্রীশ। কবে যাচ্ছ?

বিদ্যাসাগর। আজই, তুমি একটু ব'স, আমি রান্নাটা দেখে আসছি।

চলিয়া গেলেন। দুর্গাচরণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন

দুর্গাচরণ। শ্রীশ যে, কবে এলে?

শ্রীশ। আজই।

দুর্গাচরণ। ঈশ্বর কোথা?

শ্রীশ। ভেতরে গেছে, কি একটা চিঠি পেয়ে ও তো কালনা চলল।

দুর্গাচরণ। কালনা! কি চিঠি?

শ্রীশ। ওই যে টেবিলে রয়েছে।

দুর্গাচরণ চিঠিটা লইয়া পড়িলেন

দুর্গাচরণ। এ তো দেখছি মার্শাল সায়েবের চিঠি, লিখছেন যে যদি সোমবারে তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে এনে হাজির করতে পার, তা হ'লে তোমার অনুরোধমত তাঁকেই ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ দেওয়া হবে। এর মানে কি?

শ্রীশ। ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ তো মার্শাল সায়েব ঈশ্বরকেই দেবেন ঠিক করেছেন শুনলাম।

দুর্গাচরণ। আমিও তো তাই শুনেছি।

বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন

বিদ্যাসাগর। দুর্গা এসেছিস, ভালই হয়েছে, তুই রাত্রে এখানেই থাক, আমি কালনা যাব।

দুর্গাচরণ। হঠাৎ কালনা?

বিদ্যাসাগর। তারানাথ তর্কবাচস্পতির কাছে একটু দরকার আছে।

দুর্গাচরণ। কি দরকার?

বিদ্যাসাগর। সব কথা নাই বা জানলি। বেগুনের তরকারিটা চড়িয়ে দিয়েছি, দেখগে যা, পুড়ে না যায়।

দুর্গাচরণ চলিয়া গেলেন

শ্রীশ, আমি কালনা থেকে ফিরে আসি, তারপর তুমি এস, বুঝলে?

শ্রীশ। আচ্ছা, এখন চলি তবে, বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে তর্কটা কিন্তু মুলতুবি রইল।

বিদ্যাসাগর। বেশ।

চলিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগরও ভিতরের দিকে যাইতেছিলেন, এমন সময় রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন আসিয়া পুনরায় প্রবেশ করিলেন

কৃষ্ণমোহন। Sorry to disturb you again.

বিদ্যাসাগর। মদনের কাছ থেকে খাতাখানা পেয়েছ তো, নিয়ে গেলে কেন?

কৃষ্ণমোহন। ভুলে। ওর নিজের খাতা বুঝি একটা ছিল এখানে, সেইটে নিতে এসে এইটে নিয়ে গেছে—

বিদ্যাসাগর। এত অন্যমনস্ক! কাব্য-রোগেই খেলে ওকে—তার ওপর নোনা ধরেছে!

কৃষ্ণমোহন হাসিলেন

কৃষ্ণমোহন। তোমাকে যা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম, এই যে খবরগুলো দিয়েছ [খাতা খুলিয়া দেখাইলেন], এগুলো সব নির্ভরযোগ্য তো?

বিদ্যাসাগর। আমি যে যে বই থেকে টুকে দিয়েছি, সেগুলো নির্ভরযোগ্য ব'লেই তো বিশ্বাস করি। তুমি আর একবার মিলিয়ে নিও অন্য পাঁচটা বইয়ের সঙ্গে।

কৃষ্ণমোহন। বেশ, তাই করা যাবে, many thanks.

অবগুণ্ঠনবতী বিধবা সমভিব্যাহারে রাজকৃষ্ণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন

রাজকৃষ্ণ। আমার স্ত্রী এঁকে কি বলেছেন জানি না ভাই, ইনি তো কিছুতেই আমাদের বাড়িতে থাকতে চাইছেন না। নিরুপায় হয়ে শেষে এইখানে নিয়ে এলাম।

সকলেই স্তম্ভিত

বিদ্যাসাগর। এখানে! এখানে উনি কি থাকতে পারবেন? যদি পারেন, আমার অবশ্য কোন আপত্তি নেই। আমি কিন্তু থাকব না, আমাকে কালনা যেতে হবে আজকে। দুর্গা থাকবে বাসায়।

রাজকৃষ্ণ। কিন্তু পুরুষমানুষের বাসায় থাকাটা কি ঠিক হবে? মানে—

ইতস্তত করিয়া থামিয়া গেলেন। বিধবা অধোবদনে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন

কৃষ্ণমোহন। [সহসা] If you permit me, I may solve the problem. [বিধবাটিকে] আপনার বিপদের কথা শুনেছি আমি, আপনার কোন ভয় নেই, আপনি যদি রাজি থাকেন, আপনাকে ভদ্রভাবে উদ্ধার করতে পারি আমি।

রাজকৃষ্ণ। আপনি! আপনি কি করবেন?

কৃষ্ণমোহন। আপনারা যা করতে পারবেন না। আপনারা ওঁকে অপমান করতে পারবেন, কিন্তু বাঁচাতে পারবেন না। আমি তা পারব।

রাজকৃষ্ণ। ক্রিশ্চান করবেন নাকি?

কৃষ্ণমোহন। সে যাই করি, ওঁর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে যা যা দরকার সব করব। যাবেন আপনি আমার সঙ্গে?

বিদ্যাসাগর। কোথা নিয়ে যাবে?

কৃষ্ণমোহন। To my fold. ওঁর যদি সে জায়গা ভাল না লাগে, কাল আবার রেখে যাব এখানে।

রাজকৃষ্ণ। ক্রিশ্চান করবেন কি না সেইটে জানতে চাই।

কৃষ্ণমোহন। উনি যদি রাজি থাকেন নিশ্চয় করব, ভদ্রভাবে বিয়ে পর্য্যন্ত দেব ওঁর। যদি না রাজি থাকেন, তা হ'লে অবশ্য—

Shrug করিলেন

রাজকৃষ্ণ। না, তা আমি হতে দিতে পারি না।

কৃষ্ণমোহন। আপনার হতে দেওয়া না দেওয়ার ওপর তো কিছুই নির্ভর করছে না। ইনি যদি রাজি থাকেন, নিয়ে যাব, এবং প্রাণপণে চেষ্টা করব ওঁর ভাল করতে। রাজি আছেন আমার সঙ্গে যেতে?

বিধবা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল

আসুন তা হ'লে। আচ্ছা চলি, good night.

বিধবাকে লইয়া চলিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

ক্রমশ

"বনফুল"

মনঃসমীক্ষণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বপ্ন

অব্যক্ত অংশ হইতে ব্যক্ত অংশে পরিণতির দ্বিতীয় সূত্রটির নাম অভিক্রান্তি (Displacement)। অব্যক্ত অংশের কোন একটি প্রকরণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক প্রকরণের রূপ ধরিয়া প্রকাশ হইতে পারে। এইজন্য স্বপ্নের যথার্থ অর্থ উপলব্ধি করা অনেক সময় দুরূহ হইয়া পড়ে। যেমন সুহাস সেদিন যদিও স্বপ্নে সম্রাটকে দেখিয়াছিল, কিন্তু বিশ্লেষণের ফলে জানা গেল যে স্বপ্নের অব্যক্ত অংশ সম্রাটের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্ক-বিহীন আর এক ব্যক্তিকে নির্দ্দেশ করিতেছে। আবার এমন অভিক্রান্তিও হয়, যাহার ফলে অব্যক্ত অংশে যে সকল প্রকরণ থাকে ব্যক্ত অংশে প্রকাশকালে তাহাদের পরস্পরের গুরুত্বের মধ্যে বিপর্য্যয় ঘটে। যেমন স্বপ্নে হিংস্র ব্যাঘ্র দেখিয়া ভয় হইল না, অথচ সেই স্বপ্নেই নিরীহ একটি মেষশাবক দেখিয়া ভয়ে ঘুম ভাঙিয়া গেল। বাঘ দেখিয়া ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক, মেষশাবক দেখিয়া নহে, কিন্তু অভিক্রান্তিবশত স্বপ্নের ব্যক্ত অংশে এরূপ ওলট-পালট ঘটিয়াছে।

স্বপ্নের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অব্যক্ত অংশের সমস্ত প্রকরণই দার্শন প্রতিরূপ-(visual imagery)-এর আকারে পরিণত হইয়া ব্যক্ত হয়, অর্থাৎ স্বপ্ন আমরা দেখি। অতীত কিম্বা ভবিষ্যতের কোন ঘটনা দেখাইতে হইলে নাটকে যেমন তাহাকে বর্ত্তমানের রূপ দিতে হয় (ত্রেতাযুগের সীতা যেমন কলিযুগে আমেরিকার মিসেস রাম রূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন), স্বপ্নেও তেমন বর্ত্তমানের রূ

না দিয়া অতীত অথবা ভবিষ্যৎ ব্যক্ত করা যায় না। যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে অব্যক্ত অংশের সমস্ত বস্তু বর্ত্তমানের দৃশ্য ঘটনাবলীর চিত্রে রূপান্তরিত হয়, ফ্রয়েড তাহার নাম দিয়াছেন নাটন (Dramatisation)। কলেজের ছুটি হইলে কার্সিয়ং যাইব—ভাবী ঘটনার এই ইচ্ছাটি স্বপ্নে—কলেজের ছুটি হইল, দার্জ্জিলিং মেলে উঠিলাম, ট্রেন ছাড়িয়া দিল, এইরূপ চিত্রাবলীর ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়।

বিভিন্ন প্রকরণের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক, কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ, বৈপরীত্য, সাদৃশ্য প্রভৃতি, বা গুণবাচক (adjectives and adverbs), নঙর্থক (negatives), সংযোজক (conjunctions) ইত্যাদি পদগুলি কিরূপ ভাবে ব্যক্ত অংশে প্রকাশ পায়, সে সম্বন্ধে ফ্রয়েড ও অন্যান্য মনঃসমীক্ষকেরা বিশেষ সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়া আরও অনেক তথ্যের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কোন একটি দ্রব্যের উপর যে আমার স্বত্বাধিকার আছে, স্বপ্নে ইহা ব্যক্ত করিবার একটি উপায় হইতেছে যে দ্রব্যটির উপর আমি বসিয়া আছি। 'অধিকার' এই অমূর্ত্ত সম্পর্কটি 'দ্রব্যটির উপর বসিয়া থাকা' এই মূর্ত্ত চিত্রটির ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইল।

বিশ্লেষণ করিতে যাইবার পূর্ব্বে স্বপ্ন সম্বন্ধে আর একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, অন্যের নিকট বলিবার সময় স্বপ্নবৃত্তান্তের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। কোন দৃষ্ট অংশ হয়তো বাদ পড়িয়া যায়, আবার কোন নূতন অদৃষ্ট অংশ হয়তো আসিয়া পড়ে। জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, বর্ণনা করিবার সময় স্বপ্নের এই যে পরিবর্ত্তন হয়, মনঃসমীক্ষকেরা ইহার নাম দিয়াছেন অনুযোজনা (Secondary elaboration)।

মোটামুটিভাবে রূপান্তরের প্রধান সূত্রগুলির কথা বলিলাম। কিন্তু

শুধু এই সূত্রগুলির বিষয় অবগত হইলেই যে স্বপ্নের বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইবে, এরূপ ধারণা করা সমীচীন নহে। সংক্ষেপন, অভিক্রান্তি প্রভৃতি বিষয়গুলি স্বপ্নের আকৃতির গঠন-প্রণালীর নির্দ্দেশ করে মাত্র। কিন্তু বাহ্যিক আকৃতিই তো সব নয়; বস্তুবিশেষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তাহার আকৃতি ও গঠন-প্রণালী যেমন জানা প্রয়োজন, তাহার প্রকৃতির বিষয়েও তেমনই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। স্বপ্ন সম্বন্ধেও এ যুক্তি প্রযোজ্য। স্বপ্নের প্রকৃতি, অর্থাৎ ইহার উপাদান, অর্থ প্রভৃতি সবিশেষ জানিতে না পারিলে ইহার সম্বন্ধে ধারণা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে এখনও পর্য্যন্ত কিছু বলা হয় নাই; সুতরাং এইবার সেই বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

ফ্রয়েডের মতে, স্বপ্নমাত্রই ইচ্ছা-পরিপূরক, অর্থাৎ যে সমস্ত আশা কামনা প্রভৃতি বাস্তব জীবনে জাগ্রত অবস্থায় পূর্ণ হইতে পায় না বা পারে না, নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে তাহা পূর্ণ হয়। সুতরাং স্বপ্নের উপাদান হইল ইচ্ছা, এবং মানসিক জীবনে তাহার কার্য্য হইল সেই ইচ্ছা পূরণ করা। শিশুরা যে স্বপ্ন দেখে, মনোযোগের সহিত সেগুলি লক্ষ্য করিলে এই তথ্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। খেলিবার জন্য বল কিনিয়া দিবেন অথবা ছুটিতে আলিপুরে পশুশালায় লইয়া যাইবেন বলিয়া আপনি আপনার পুত্র 'বোকা'কে আশ্বাস দিলেন, কিন্তু কার্য্যগতিকে কোনটিই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বোকা রাত্রে স্বপ্ন দেখিল যে, সে মহোল্লাসে ভ্রাতা বোঁচার সহিত বল লইয়া খেলা করিতেছে অথবা পশুশালায় হস্তিপৃষ্ঠে চড়িয়া বেড়াইতেছে। জাগ্রত অবস্থায় ব্যাহত ইচ্ছা স্বপ্নে চরিতার্থ হইল।

আপনারা নিশ্চয়ই ভাবিতেছেন, এইরূপ ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া

যদি ফ্রয়েডের স্বপ্ন সম্বন্ধে মতামত গড়িয়া উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই মত নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর এবং মনোযোগের সহিত অধ্যয়নের অযোগ্য। কারণ এই অত্যন্ত লঘু ও ক্ষুদ্রপরিসর ভিত্তির উপর কোন কিছুই গড়িয়া তোলা চলে না। উপরন্তু, ভিত্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও তথ্যটির বিরুদ্ধেও প্রচুর আপত্তির কথা আপনাদের মনে জাগিতেছে। 'স্বপ্ন ইচ্ছা-পরিপূরক'—তাহা কখনও সম্ভব হইতে পারে? কোন সাধারণ বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি ক্ষণকালের জন্যও এ তথ্য মানিয়া লইতে পারে? সেদিন প্রবাসী বন্ধুর অসুখের স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহা হইলে কি স্বীকার করিতে হইবে যে, আমার ইচ্ছা ছিল বন্ধুটির অসুখ হউক? বিশিষ্ট কোন নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুর স্বপ্ন বোধ হয় সকলেই কোন না কোন সময়ে দেখিয়াছেন, তাহা হইলে কি ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, আত্মীয়ের মৃত্যুর বাসনা স্বপ্নদ্রষ্টার মনে জাগিয়াছিল? উপরন্তু, যে সমস্ত আজগুবী বস্তু বা অসম্ভব ঘটনা স্বপ্নে দেখা যায়, তাহাদের ব্যাখ্যা কি করিয়া হইবে? দেবেন মিত্রের ব্রহ্মার মত পাঁচটি মুখ হউক এ ইচ্ছা আমি কোন দিনই করি নাই, কারণ তাহার একটি মুখের বাক্যস্রোতেই আমরা সকলে ভাসিয়া যাইতে পারি, কিন্তু তবু স্বপ্নে পঞ্চমুখ দেবেন্দ্রনাথ দেখিয়াছিলাম। কি একটি সিনেমার ছবি দেখিয়া আসিয়া রাত্রে দীপু স্বপ্ন দেখিয়াছিল যে, সে রেলযোগে আকাশ-পরিভ্রমণ করিতেছে এবং যাহাতে উত্তাপ আদৌ না লাগে তাই সূর্য্যের পিছন দিক দিয়া যাইতেছে। এই জাতীয় স্বপ্নে কোন্ ইচ্ছা পূর্ণ হয়?

এই ধরনের নানারূপ আপত্তির কথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা শীঘ্রই উপলব্ধি করিব, আপত্তিগুলি যেরূপ মারাত্মক বলিয়া মনে হইতেছে, আসলে সেগুলি আদৌ সেরূপ নহে। এমন কি, সেগুলি আপত্তি হিসাবে বিবেচিত হইতেই পারে না। ফ্রয়েডের তথ্য খণ্ডন

করিবার উদ্দেশ্যে উপরিউক্ত ঘটনাবলীর কোনটিই বিপরীত যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করা চলে না।

প্রথমেই বলি, শিশুদের স্বপ্নাবলী ফ্রয়েডের তথ্যের ভিত্তি নয়, দৃষ্টান্ত মাত্র। স্বপ্নতত্ত্ব ফ্রয়েডের প্রথম অনুসন্ধানের বিষয় ছিল না। মানসিক রোগের চিকিৎসা করিতে করিতে স্বপ্নের সহিত রোগ-লক্ষণের এবং রোগীর ব্যবহারের যোগাযোগ আছে লক্ষ্য করিয়া তিনি স্বপ্ন বিষয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার তথ্য রোগী এবং নীরোগ, সকল বয়সের এবং বিভিন্ন দেশের স্ত্রী ও পুরুষের বহু স্বপ্নাবলী নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণের ফল। কাজেই ভিত্তি তরল এবং অসার নহে, পরন্তু দৃঢ় ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য।

ইচ্ছা শব্দটি আমরা সচরাচর আমাদের জ্ঞাত ইচ্ছা অর্থাৎ যে ইচ্ছা আমাদের সংজ্ঞানে আছে সেই ইচ্ছা—এই অর্থে ব্যবহার করি। ইহাই ফ্রয়েডের তথ্য ভুল বুঝিবার একটি কারণ। ফ্রয়েড তাঁহার স্বপ্নতত্ত্বে কথাটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, শুধু সংজ্ঞানে নয়, আসংজ্ঞানে এবং বিশেষ করিয়া নির্জ্ঞানে যে ইচ্ছা থাকে, স্বপ্নে তাহা চরিতার্থ হয়। অবদমিত ইচ্ছাগুলি নির্জ্ঞানে প্রাণহীন জড় অবস্থায় পড়িয়া থাকে না, ক্রমাগতই প্রহরীকে এড়াইয়া সংজ্ঞানে আসিবার চেষ্টা করে। স্বরূপে সোজাসুজিভাবে আসিতে পারে না বলিয়া নানারূপ বিকৃতির মধ্য দিয়া তাহারা সংজ্ঞানে আত্মপ্রকাশ করে। দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তি, স্বপ্ন, শুচিবাইএর ন্যায় নানারূপ বাই, মানসিক রোগ, এ সমস্তই অবদমিত ইচ্ছার মনের প্রহরীর সহিত সংঘাতের ফল।

স্বপ্নে যে নিকট আত্মীয়কে দেখিয়াছিলেন, তিনি হয়তো অন্য এক ব্যক্তির প্রতীকরূপেই আসিয়াছিলেন, সুতরাং দৃষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু-কামনা

আপনি করিয়াছিলেন, এরূপ ব্যাখ্যা করিয়া লওয়া সঙ্গত নয়। অনুসন্ধান করিতে হইবে, ব্যক্ত অংশে দৃষ্ট ব্যক্তি অব্যক্ত অংশে কাহাকে নির্দ্দেশ করিতেছে। এ অনুসন্ধানের একমাত্র উপায় অবাধ ভাবানুষঙ্গ প্রণালী। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া ব্যক্ত অংশের অন্যান্য প্রকরণগুলিও বিশ্লেষণ করিতে হইবে, তবেই স্বপ্নব্যাখ্যা সম্ভব হইবে। দৃষ্টান্তের দ্বারা স্বপ্ন-ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া তাই অতীব দুরূহ। ক্ষুদ্র একটি স্বপ্ন যাহা দুই লাইনে লিখিয়া ফেলা যায়, অবাধ ভাবানুষঙ্গ প্রণালীর সাহায্যে অন্তর্নিহিত সমস্ত চিন্তা ভাব প্রভৃতি উদ্ধার করিয়া সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিতে হয়তো দুই সহস্র লাইনও যথেষ্ট হইবে না। আরও একটি কথা আছে। একের স্বপ্নের ব্যাখ্যা অপরের নিকট কখনই যেন তেমন হৃদয়গ্রাহী হয় না। তাহার কারণেরও ইঙ্গিত করা যায়। ভুলভ্রান্তি ব্যাখ্যা করিতে সাধারণত মনের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে হয় না। উপর দিকের স্তর হইতেই তাহাদের হেতুর সন্ধান পাওয়া যায়। একদেশবাসী ব্যক্তিদিগের পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেমন মোটামুটি একই রকম, একই সমাজভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মানসিক পরিবেষ্টনীও তেমনই অনেকাংশে একই প্রকার। পরস্পরের মনের উপর দিককার স্তরে তাই যথেষ্ট মিল থাকে। সেইজন্য একজনের ভুলভ্রান্তির ব্যাখ্যা মানিয়া লইতে অপরে বিশেষ আপত্তি করে না। কিন্তু স্বপ্ন ব্যাখ্যা করিতে হইলে মনের বহু নিম্নস্তর পর্য্যন্ত যাইতে হয়। পরস্পরের মনের সেই গভীর দেশে ঐক্য অপেক্ষা অনৈক্যই অধিক। তাই একই ধরনের স্বপ্ন বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারে, এবং সেইজন্যই একের স্বপ্নের ব্যাখ্যা অন্যে মানিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করে। গভীর অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা নিজের নির্জ্ঞান সম্বন্ধে যতই সচেতন হওয়া যায়, ততই এই দ্বিধা দূরীভূত হইতে থাকে।

দিবসের জাগ্রত অবস্থার কোন একটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন রচিত হইতে আরম্ভ হয়। কোন্ রুদ্ধ ইচ্ছা সফল হইতেছে তাহা অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখা গিয়াছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বপ্নদ্রষ্টার বাল্যজীবন পর্য্যন্ত পৌছাইতে হয়। সুতরাং শিশুমনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান না থাকিলে স্বপ্নের সুচারু ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা সফল না হইবারই সম্ভাবনা। মনঃসমীক্ষকেরা তাই শিশুমন সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। অধুনা কয়েকটি বিশিষ্ট মহিলা সমীক্ষক (Anna Freud, Helene Deutsch, Melanie Klein প্রভৃতি) অধ্যবসায়ের সহিত এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে ব্যাপৃত আছেন। শিশুমনের গতি, বিশেষ করিয়া শিশুদের কামজীবনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমাদেরও পরে চর্চ্চা করিতে হইবে।

স্বপ্নে প্রতীকের (symbols) ব্যবহার বিস্তৃতভাবে হইয়া থাকে। অব্যক্ত অংশের প্রকরণগুলি কখনও রূপক কখনও প্রতীকের সাহায্যে আত্মগোপন করিয়া ব্যক্ত অংশে আসে। রূপক এবং প্রতীককে কিন্তু একই বস্তু বলা চলে না। গিরীন্দ্রবাবু তাঁহার পুস্তকে বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "রূপক ও প্রতীকে প্রভেদ আছে। দেহতত্ত্বের গানে যখন আত্মাকে পাখী, বা দেহকে পিঞ্জর বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তখন তাহা রূপক মাত্র। এই রূপকের অর্থ আমাদের নিকট অজ্ঞাত নহে। কিন্তু যদি কেহ সাপের উপাসনা করেন, অথচ কেন যে সাপকে দেবতা ভাবিতেছেন তাহা যদি তাঁহার জানা না থাকে, তবেই সাপকে প্রতীক বলা চলে। অবশ্য সকল প্রতীকেরই আমরা একটা মনগড়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। প্রতীকের বিশেষত্ব এই তাহার প্রকৃত অর্থ বলিয়া দিলেও মন তাহা মানিতে চায়

না।"* প্রতীকের আর একটি বিশেষত্ব বোধ হয় এই বলা যায় যে, প্রায় সর্ব্ব দেশেই সর্ব্ব সময়েই একটি প্রতীক একই বস্তুর নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কাজেই প্রতীককে সার্ব্বজনীন বলিয়া ধরিয়া লইলে বিশেষ ভুল করা হয় না। যেমন সাপ সর্ব্বত্রই পুংলিঙ্গের, বাক্স স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের, রাজা পিতার, রাণী মাতার, গৃহ দেহের, প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের বহু প্রতীকের কথা আপনারা সহজেই মনে করিতে পারিবেন।

প্রতীকগুলি মনঃসমীক্ষকদিগের সৃষ্টি নয়, এ কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। মনঃসমীক্ষণের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রতীকগুলির অর্থ সাধারণের মধ্যে প্রচারিত ছিল। একটি কথা কিন্তু এ সম্বন্ধে বলিয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। অভিধানের সাহায্যে বিদেশীয় কথাগুলি মাতৃভাষায় অনুবাদ করিতে পারিলেই যেরূপ বিদেশীয় ভাষায় প্রকাশিত বক্তব্যটির অর্থ উপলব্ধি করা যায়, স্বপ্নে দৃষ্ট প্রতীকগুলির অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেই সেইরূপ স্বপ্নের অর্থটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে, এ ধারণা কেহ যেন ক্ষণকালের জন্যও মনে স্থান না দেন। অনেক "বৈজ্ঞানিক" পুস্তকে এবং অনেক "জ্ঞানী" ব্যক্তির নিকট স্বপ্নাবলীর ঐ ধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে ব্যাখ্যা গ্রহণ না করাই সমীচীন।

প্রতীকগুলি যেমন সার্ব্বজনীন, তেমনই কতকগুলি স্বপ্নও সার্ব্বজনীন বলিয়া মনে করি। শূন্যে উড়িয়া বেড়ানো, উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া যাওয়া, নগ্ন অবস্থায় সভার মধ্যে বিচরণ করা, পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়া প্রভৃতির কোনও একটি বা ততোধিক স্বপ্ন সকলেই কোন না কোন সময় দেখিয়া থাকিবেন। সম্ভবত যৌবনের প্রারম্ভে ও তৎপূর্ব্বেই এরূপ স্বপ্ন দেখা যায়। কলেজে অধ্যয়নকালে সহপাঠী সুশীল একটি স্বপ্ন বারবার

* 'স্বপ্ন' পৃ. ১১০।

একই ভাবে দেখার কথা প্রায়ই বলিত। স্বপ্নটি এই—বিশেষ উচ্চ নয় এরূপ একটি তক্তাপোশের উপর শুইয়া সে নিদ্রা যাইতেছে, পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিবার সময় হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া গেল। এই সকল সার্ব্বজনীন স্বপ্ন (typical dreams) সর্ব্বত্র ও সর্ব্ব সময়ে একই কারণে ঘটে কি না, অর্থাৎ একই রুদ্ধ ইচ্ছা প্রকাশ করে কি না, সে বিষয়ে মতভেদ আছে, স্থির নির্ণয় এখনও হয় নাই। সম্ভবত দেশকাল-ভেদে এই জাতীয় স্বপ্নের অর্থের তারতম্য ঘটে।

স্বপ্নে ভবিষ্যৎ ঘটনার নির্দ্দেশ পাওয়া যায় কি না, এ বিষয়ে অনেকেরই কৌতূহল আছে। স্বপ্ন দেখিলাম, অমুক ব্যক্তি অমুক সময় মারা গিয়াছেন; তাহার পর খবর পাইলাম, ঠিক সেই সময় সেই ব্যক্তি সত্যই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, এরূপ অভিজ্ঞতার কথা অনেকেই বলিবেন। তাঁহারা প্রশ্ন করিবেন, ইহা হইতে কি প্রমাণ হয় না যে, স্বপ্নের অর্থ হইতেছে ভবিষ্যৎ ঘটনার ইঙ্গিত করা? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, প্রথমত স্বপ্নের সহিত বাস্তবের এইরূপ আশ্চর্য্য মিল হইয়া যাইবার বিবরণ খুব বেশি পাওয়া যায় না। বিপরীত দৃষ্টান্তের সংখ্যাই বরং অনেক বেশি। ডার্‌বিতে প্রথম পুরস্কার পাইবার স্বপ্ন কয়জনের ভাগ্যে বাস্তবে পরিণত হইয়াছে? দ্বিতীয়ত, স্বপ্ন দেখা একটি ঘটনা, তাহার সহিত বাস্তবের মিল হইয়া যাওয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ঘটনা। দ্বিতীয় ঘটনাটির নানা কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের উপর ভিত্তি করিয়া প্রথম ঘটনাটির ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হইবে না। উপরন্তু, স্বপ্ন ভবিষ্যৎ ঘটনার ইঙ্গিত করে—এ তথ্য মানিয়া লইলে অধিকাংশ স্বপ্নেরই কোন অর্থই করা যাইবে না। সুতরাং এই তথ্য অপেক্ষা ফ্রয়েডের তথ্য যে অধিকতর ব্যাপক ও কার্য্যকরী, তাহা স্বীকার করিতেই হয়।

স্বপ্ন ইচ্ছা পূর্ণ করে, এই মতের বিরুদ্ধে আর এক দিক হইতে উপরি-উক্ত আপাত্তি অপেক্ষা গুরুতর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইতে পারে। ইচ্ছা পূর্ণ হইলে আনন্দই হইয়া থাকে, ইহাই স্বাভাবিক। আশার ছলনা, ইচ্ছার পরাভব—ইহাই তো আমাদের জীবনের অধিকাংশ দুঃখ-অশান্তির মূল। স্বপ্নের কার্য্য যদি হয় ইচ্ছার পূরণ করা, তাহা হইলে স্বপ্নমাত্রই আনন্দপ্রদ হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের সব স্বপ্নই কি সুখের স্বপ্ন? স্বপ্ন দেখিয়া আতঙ্কে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যাওয়ার দৃষ্টান্ত কি বিরল?

স্বীকার করিতেই হইবে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। স্বপ্ন দেখার ফলে কখনও কখনও আশঙ্কায় ঘুম ভাঙিয়া যায়, এ কথা খুবই সত্য। এই জাতীয় স্বপ্নকে মনঃসমীক্ষকেরা উৎকণ্ঠা-স্বপ্ন (anxiety dreams) বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের অস্তিত্ব সত্ত্বেও ফ্রয়েডের তথ্য বর্জ্জন করিবার কোন কারণ নাই। স্বপ্নে অবদমিত ইচ্ছা পূর্ণ হয়। কি ধরনের ইচ্ছা অবদমিত হয় এবং অবদমন-ক্রিয়া মানসিক জীবনে কখন হইতে আরম্ভ হইয়া কি ভাবে চলিতে থাকে, সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত হইলে উৎকণ্ঠা-স্বপ্নের রহস্য ভেদ করিতে কষ্ট পাইতে হয় না। এখানে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, নিছক ইচ্ছা করিবার পথে মানুষের মনের কোন বাধাই নাই। এমন অনেক ইচ্ছাই মানুষ করিয়া বসে, যাহা সফল হইলে বিপদেরই কারণ হইয়া পড়ে। কোন কোন ইচ্ছা যে অপূর্ণ থাকে, তাহা সুখেরই বিষয়, দুঃখের নহে। কবি সেইজন্যই গাহিয়াছেন, "আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।" যাহা স্পর্শ করিব তাহাই স্বর্ণ হইয়া যাইবে, এ ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া মিডাসের (Midas) পক্ষে সুখের বিষয় হয় নাই। যাহাতে হাত দিব তাহাই ছাই হইয়া যাইবে, মহাদেবের নিকট এই বর পাইয়া

ধূম্রলোচনকে পুড়িয়া মরিতে হইয়াছিল। শিশুদের মনে এমন কতকগুলি ইচ্ছা জাগে, যেগুলি পূর্ণ হইলে তাহাদের পক্ষে ক্ষতি যাহা হইবে এ আশঙ্কা তাহারা করে। তাই সেই ইচ্ছাগুলিকে তাহারা মন হইতে তাড়াইয়া দেয় অর্থাৎ নির্জ্ঞানে পাঠাইয়া দেয়। নির্জ্ঞানে সেই সব অবদমিত ইচ্ছার সহিত আশঙ্কা ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত থাকে। স্বপ্নে সেই ধরনের ইচ্ছা যখন পূর্ণ হইবার পথে অগ্রসর হয়, তখন তৎসহজড়িত আশঙ্কাও সংজ্ঞানে আসিতে থাকে। কিন্তু এ আতঙ্ক সংজ্ঞান মনের অসহ্য। তাই নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। তখন 'ইহা স্বপ্নমাত্র' এই আশ্বাস পাইয়া মন এই আতঙ্কের কবল হইতে পরিত্রাণ পায়।

স্বপ্ন সম্বন্ধে সব কথাই যে বলা হইল, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। মনঃসমীক্ষকেরা বিষয়টির যেরূপ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার মূল কয়েকটি কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। জিজ্ঞাসুদের শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু-প্রণীত 'স্বপ্ন' পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। মানসিক ঘটনাবলী—শুধু মানসিক কেন নৈসর্গিক ঘটনাবলীও বটে—এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল যে কোনও একটি বিষয় সুচারুভাবে বুঝিতে হইলে অন্যান্য কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করাও একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে তাই অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাইবে।

ক্রমশ

শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র

ওরা ও আমরা

হোথা তাণ্ডবে নাচে রণ-চণ্ডিকা—
বাজে ঘন রণ-দামামা,
হেথা নাচিছে রাষ্ট্র-রঙ্গ-মঞ্চে
বৈষ্ণবী-বেশে শ্যামা মা।

ওরা অম্বরে আর অর্ণবে ভূমে
আহবে ফিরিছে মাতিয়া,
মোরা মিহিস্বরে গাই—কেমনে
গো ভাই
তুঁহু বিনা দিন রাতিয়া!

ওরা গড়িতে বজ্র দধিচির মত
অর্পিছে নিজ অস্থি,
মোরা জীবন-যুদ্ধে সৈনিক—শুধু
সম্বল করি স্বস্তি।

ওরা ধরারে করেছে সরার মতন
আয়তন মৃৎ-পাত্র,
মোরা কণ্ডুয়নের ক্লেশে হেরি যেন
যোজন-বিথারী গাত্র।

ওরা চূর্ণ করিয়া প্রাচীন পৃথ্বী
গড়িতেছে নব সৃষ্টি,

মোরা দর্শন লয়ে দর্শনহীন—
ধেয়ান-স্তিমিত-দৃষ্টি।

ওরা ধরণীর গৃহ-প্রাঙ্গণ হতে
গৃহপানে মেলে পক্ষ,
মোরা বাহিরিলে পথে ধাই মনোরথে
গৃহ করি সদা লক্ষ্য।

ওরা উদ্দাম যবে উদ্ধত পদে
দলিতে গৌরী-শৃঙ্গ,
মোরা অঞ্চল ঘিরি গুঞ্জরি ফিরি—
মধুলোভী যেন ভৃঙ্গ।

ওরা মৌন বিরলে অনুসরি চলে
কার্য্যের নির্ঘণ্ট,
মোরা অবসর-ক্ষণে ঘোর গরজনে
মুখরিয়া তুলি কণ্ঠ।

তবু কেহ এ প্রাচীন প্রাচ্যে
ঠিক কথা নাহি কয়—কথা কওয়া
হেথা শুধু ভাববাচ্যে। হয়

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

অজানার মোহ

না:, বেচারামের আচরণ ক্রমশ জটিল ও রহস্যময় হইয়া উঠিল দেখিতেছি। প্রথম যখন উহার দোকানে জিনিস লইতে আরম্ভ করি, তখন দেখা হইলে সে প্রতি বারই আভূমি নত হইয়া নমস্কার করিত,—সে কি ভক্তি! দোকানে কোনও নূতন ও উৎকৃষ্ট দ্রব্য আসিলে উহা আমাকে অযাচিতভাবে পাঠাইয়া দিত। ভুতো মূল্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে বলিত, তোর সে খোঁজে দরকার কি? সে আমি বাবুর সঙ্গে বুঝব; মনে কর না, বাবুকে অমনই খেতে দিচ্ছি। আর সেই বেচারাম সেদিন সামান্য কয়েকটা টাকা বকেয়া বাকির জন্য কতকগুলা রূঢ় বাক্য শুনাইয়া গেল, একটুও বাধিল না! তাই ভাবিতেছি, উহার ভক্তি চটিল কেন?

দেখিতেছি, অজানাকে জানিবার জন্য, আপন করিবার জন্য সকলেই উৎসুক। যাহা জানা অর্থাৎ আপনার হইয়াছে বা আয়ত্তে আসিয়াছে, উহার জন্য কেহই মস্তিষ্ক আলোড়িত করে না—অনাদরে অবহেলায় উহা ক্রমশ পর হইয়া যায়। যাহা সাধারণ এবং সহজবোধ্য, তাহাই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। উহাতে কেহই আকৃষ্ট হয় না—ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা দূরের কথা। যত গোলমাল, যত ছুটাছুটি, যত উদ্দাম নৃত্য, যত হাহুতাশ, যত ফোঁপানি, যত অশ্রুজল অজ্ঞাত দুর্বোধ্য এবং দুর্জ্ঞেয়কে লইয়া।

জলাভ্যন্তরস্থিত মৎস্যের আকার ও প্রকার সম্পূর্ণ অজানা, উহাকে জানিবার জন্য দিনের পর দিন তীর্থবায়সের অনুকরণে বসিয়া থাকি; কত রৌদ্র বৃষ্টি মাথার উপর দিয়া গেলেও গ্রাহ্য নাই। মৎস্যজাতির

লোভনীয় কত খাদ্যদ্রব্য অপচয় করি। কিন্তু যখন অজানা বস্তুটিকে জানিলাম, যখন মৎস্য আয়ত্তে আসিল, তখন মৎস্যটিকে স্বোপার্জ্জিত খাবি ভক্ষণ করিয়াই সে যাত্রা সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। সদ্যক্রীত একজোড়া জুতার অঙ্গসৌষ্ঠব ও স্বাস্থ্যের প্রতি যেরূপ সতর্ক এবং সস্নেহ দৃষ্টি রাখি, অধিক ক্ষেত্রে নিজ সহোদরের ভাগ্যেও সেইরূপ ঘটিয়া উঠে না।

সেইজন্যই বোধ হয়, সকল বস্তুরই পূর্ণতা আমাদের সেরূপ আনন্দ দিতে পারে না। পূর্ণিমার চাঁদ অপেক্ষা চতুর্দ্দশীর চাঁদ কবিগণের অধিক রুচিকর (নীল আকাশে ভাসছে যেন চতুর্দ্দশীর চাঁদ)। প্রস্ফুটিত কুসুম অপেক্ষা কোরক শ্রেষ্ঠ। ফ্যালফ্যালায়মান চাহনি অপেক্ষা আড়নয়নে চাহনির আকর্ষণী শক্তি অধিক, প্রয়োজনাধিক দন্তবিকাশ অপেক্ষা মুচকি হাসি অধিক কার্য্যকরী, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত দরজা অপেক্ষা আড়কপাট অধিক রহস্যময়। যুবতীর অপেক্ষা কিশোরীর মর্য্যাদা অধিক, এবং বোধ হয় পুরা বেতন না দিয়া ইন্‌কাম-ট্যাক্স কাটিয়া লইবার ব্যবস্থা এই কবিত্বটুকু বজায় রাখিবার একটা নীরব উদ্দেশ্যপূর্ণ রাজকীয় কৌশল মাত্র।

পূর্ণতা হইতেই আশু ক্ষয়ের আভাস পাওয়া যায়; কিন্তু অপূর্ণ অধিকতর পূর্ণতার লোভ দেখায়, অথচ একেবারে বঞ্চিতও করে না। বারো আনা নগদ দিয়া বাকি চারি আনার আশায় রাখে এবং এই অপ্রাপ্ত চারি আনার মধ্যে যে আশা, যে আনন্দ, যে রহস্য লুক্কায়িত থাকে, পূর্ণতা উহা প্রদান করিতে পারে না।

সেই কারণেই বেতন অপেক্ষা উপরি পাওনা অধিক লোভনীয়, ফাউ এত মিষ্টি। সেইজন্যই বোধ হয় ঠাকুরদাদা মহাশয় পৌত্রের প্রবেশিকা পরীক্ষায় মাসিক দশ টাকা বৃত্তিপ্রাপ্তির সংবাদে সেরূপ উল্লসিত হইয়া উঠিতে পারেন নাই, উপরন্তু পৌত্রের সত্যবাদিতায় সন্দিহান

হইয়াছিলেন। উপরি পাওনা নাই এ কেমনতর পাওনা, এ কিরূপ জলপানি? এরূপ পাওনার মূল্য কি? ইহা যে সম্পূর্ণ, ইহাতে অজানা কিছুই নাই; বার্ষিক ছিয়ানব্বই টাকা বেতনে জমিদারি-সেরেস্তায় নায়েবি করিয়া তিনি তবে নিজেই একটা ক্ষুদ্র জমিদারি গড়িয়া তুলিলেন কি প্রকারে?

শিশুগণ মন দিয়া লেখাপড়া না করিলে গুরু মহাশয় রাগ করিবেন এবং নূতন পড়া দিবেন না—বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা অপেক্ষা অধিকতর কঠোর শাস্তির কল্পনা করিতে পারেন নাই। নূতন পড়া না পাইলে মানুষ বাঁচিবে কি করিয়া? যাহাতে মনুষ্যজাতি হঠাৎ ক্ষেপিয়া না উঠে অথবা একযোগে সকলে আত্মহত্যা করিয়া না বসে, সেই কারণেই বোধ হয় জগতে এত বৈচিত্র্য, এত নিত্য-নব পরিবর্ত্তন, এত অজানার প্রভাব।

এখন শীত, পরে বসন্ত, তারপর গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত। অহোরাত্রের মধ্যে আবার ক্রমশ কত পরিবর্ত্তন, কত বৈচিত্র্য! কোনও দুইটি দিনই, কোনও দুইটি মুহূর্ত্তই তো একেবারে সর্ব্বাঙ্গীণ সমভাবাপন্ন নহে।

স্বর্গে শুনিয়াছি চিরবসন্ত বিরাজমান, মলয়ানিল সমভাবেই বহিতে থাকে, জরা নাই, মৃত্যু নাই, ট্যাক্স নাই, খাজনা নাই, দেনা নাই, তাগাদা নাই, সিনেমা নাই, টিকিট কেনার হুড়াহুড়ি নাই, মামলা নাই, মোকদ্দমা নাই, আপিস নাই, সাহেব নাই, আশার উদ্দীপনা নাই, নিরাশার বেদনা নাই, ইন্‌ক্রিমেণ্ট নাই, রিডাক্‌শন নাই, সফলতার মাদকতা নাই, বিফলতার গ্লানি নাই। কেবল স্রেফ অবিমিশ্র আরাম! উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা—উহারাও শুনিয়াছি পরিবর্ত্তনহীন, স্থিরযৌবনা। এ অবস্থায় স্বর্গবাসিগণ অধিক দিন টিকিয়া থাকে কি করিয়া? যাহাতে

উহারা বিদ্রোহী হইয়া না উঠে এবং মর্ত্ত্য বা নরকের দিকে সতৃষ্ণ গোপন দৃষ্টি না হানে, সেই কারণে উহার মধ্যেই বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া রুদ্ধ নৈতিক আবহাওয়ায় উপযুক্ত পরিমাণ মর্ত্ত্যের কলুষ সংমিশ্রণ জন্য নারদ নামক একজন স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। নানারূপ জটিল পরিস্থিতির উদ্ভাবন করিয়া স্বর্গের বৈচিত্র্য বিধান করাই তাঁহার অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য, এবং অসুরদিগের মধ্যে মধ্যে স্বর্গ আক্রমণ তত্রস্থ অধিবাসীদিগকে এই আরামসঙ্কুল পরিস্থিতি হইতে রক্ষা করিবার জন্যই বিধির বিশেষ বিধান বলিয়া মনে হয়। সে হিসাবে স্বর্গবাস দৃশ্যত সুখের হইলেও বৈচিত্র্যহীন—কম লোকেই আকৃষ্ট হয়। পথও শুনিয়াছি অতিশয় দুর্গম, এবং যাত্রীসংখ্যা অল্প বলিয়া পথঘাটেরও সংস্কারসাধন বহুকাল অন্তর কখনও ঘটিয়া থাকে। সে হিসাবে নরকবাসীদের জীবন দুঃখের হইলেও ইহাতে বৈচিত্র্যের অভাব নাই। এই বৈচিত্র্যের জন্যই বোধ হয় নরকযাত্রীর সংখ্যা এত অধিক।

আপনার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অজানা, কিন্তু এই অনিশ্চিত অজানা ভাবের জন্যই জীবন আপনার নিকট দুর্ব্বিষহ বোধ হয় না। জ্ঞানোদয়ের পরই যদি দেখিতে পান যে, আপনার গলদেশে একটি পুস্তিকা লম্বমান, যাহাতে সন তারিখ হিসাবে জীবনের ঘটনাবলী বিশদভাবে বর্ণিত আছে, তাহা হইলে উহা পুনঃ পুনঃ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অল্পদিনমধ্যে আপনার কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত এবং ঘটনাবলী কিছুদিন পুস্তিকানুযায়ী ঘটিতে দেখিলে আপনার ভবিষ্য-জীবন যতই রঙিন ও মধুরভাবে বিচিত্র থাকুক না কেন, জীবন আপনার পক্ষে দুর্ব্বহ বোধ হইত। সকলই তো জানা, এ জীবন যাপন করিয়া সুখ কি?

ভগবান অদৃশ্য এবং দুর্জ্ঞেয়, সেই কারণেই সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞাতব্য তিনিই। দেবতা সশরীরে আসিয়া সেবা গ্রহণ করেন না বলিয়াই নিত্য-

সেবার এত আয়োজন, পূজায় এত ঘটা। আবরণ না থাকিলে কি উন্মোচন করিব, রহস্য না থাকিলে কি উদ্ঘাটন করিব?

নিজ পত্নীর সহিত কয়জন প্রেমে পড়িতে পারিয়াছেন এবং কয়জন পত্নীই বা তাঁহাদের স্বামীর প্রেমে মশগুল হইয়া আছেন বলিতে পারি না। মনে হয় উঁহারা পরস্পরকে আণ্ডার-সাইন করিয়া মার্জিনাল নোট লিখিয়া মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছেন। রুটিন-মাফিক কার্য্যে কেহ সুখ পায় না, সুখ পায় রিসার্চের বৈচিত্র্যে। সেইজন্যই প্রেমের অফুরন্ত উৎস রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিবাহে পর্য্যবসিত হয় নাই। সেই কারণেই মিলন অপেক্ষা বিরহ অধিক মধুর। সেইজন্যই কবিগণ পরকীয়া প্রেমের এত মাধুর্য্য দেখিয়াছেন। পরকীয়া না হইলে প্রেমের পুষ্টি হয় না। যেখানে ষোল আনা প্রাপ্তি, অন্যের বিনা আপত্তিতে, বিনা বাধায়, বিনা ওজরে ভোগদখলী স্বত্ব, সেখানে প্রেম কি করিয়া তিষ্ঠিতে পারে? প্রেমের স্বভাব অন্যরূপ।

প্রেম হইতে পারে পঞ্চাশ গজ বা ততোধিক দূরবর্ত্তী বারাণ্ডায় লম্বমান শাড়ি বা ব্লাউজের অধিকারিণীর সহিত, অদৃশ্য সুগায়িকার সহিত, প্রেম হইতে পারে চকিতদৃষ্ট মোটর-বিহারিণীর সহিত, প্রেম হইতে পারে—যাকগে।

যদিবা বিবাহের পূর্ব্বে প্রেমের সঞ্চার হইল, অল্পদিন পরে দেখা যাইবে, সেই ঘনীভূত প্রেম বিবাহের আবেষ্টনে প্রথমে দ্রবীভূত এবং তৎপরে বাষ্পের আকারে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। যাহা পড়িয়া আছে, উহার সহিত প্রেমের সম্পর্ক-নির্ণয় বহু জটিল প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা-সাপেক্ষ। আমাদের দেহের Coccyx ও Scapula অস্থি হইতে, এই ভাবেই, লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে লাঙ্গুল ও পক্ষপুটের অস্তিত্বের আভাস পাওয়া যায়।

বিবাহিত জীবনের ঝগড়াঝাটি, মান অভিমান, পিত্রালয় গমন করিবার মুহুর্মুহু ভীতি প্রদর্শন কতকটা অজানা ভাব সৃষ্টি করিয়া বহু পূর্ব্বে রুদ্ধশ্বাস ও গতজীবন প্রেমকে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করিবার উপলক্ষ্যও হাস্যকর প্রয়াস মাত্র। প্রেমাবিষ্ট অবস্থায় প্রাণনাথ, প্রিয়তমে, নাথ, প্রাণেশ্বরী—ওগো, হ্যাঁগো, শুনচো, এরা সব গেল কোথায়, আর জ্বালালে দেখছি, ভালা গেরো যাহোক—নিকুচি করেচে, প্রভৃতি অর্থহীন ও বিরক্তিজ্ঞাপক ভাষায় পর্য্যবসিত হয়।

রামবাবু বড়বধূর উদ্দেশ্যে কল্যাণীয়াসু পাঠযুক্ত ঐ যে পোস্টকার্ডটি লিখিয়া মেসের ঝিকে ডাক-বাক্সে ফেলিতে দিলেন, উহা দেখিয়া কে বুঝিবে যে, অনতিদূর অতীতে ইহারই পূর্ব্বগামী কোনও এক প্রেমপত্রে সর্ব্বসমেত এক ডজন চিঠির কাগজেও হৃদয়ের উচ্ছ্বাস সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করা সম্ভবপর হয় নাই। প্রথম চারি খণ্ড তো নিঃশেষিত হইয়াছিল সম্বোধন-সংক্রান্ত ব্যাপারের মীমাংসা লইয়া—তোমাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব! হাঃ, হাঃ, হাঃ, কলাণীয়াসু—কল্যাণ কামনাই বটে। মৃত প্রেমের সমাধি রচিত হইয়াছে এই পোস্টকার্ডে এবং কল্যাণ কামনা পরলোকগত উহারই আত্মার। একটা দীর্ঘশ্বাস যেন পঞ্জর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

ভূতো আসিয়া বলিল, বেচারাম দেখা করিতে চায়। নাঃ, লোকগুলা দেখিতেছি কোনও কাজই করিতে দিবে না। হুঁঃ, আবার বেচারাম—সেই সনাতন বকেয়া। বলিলাম, এখন দেখা হবে না বলগে যা। কতক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া রহিলাম, চিন্তাসূত্র শতধা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; কি করিব ভাবিতেছি। কিয়ৎক্ষণ পরে ভূতো পুনরায় আসিয়া এক টুকরা কাগজ হাতে দিল, নির্ম্মলচন্দ্র লাহিড়ী। নির্ম্মল লাহিড়ী? ওঃ হো, অফিসের নূতন কনট্রাক্টার। ঠিক! সে আমার বাড়ির ঠিকানা লইয়াছিল বটে। মনে মনে দন্তবিকাশ করিয়া দেখা করিতে চলিলাম। বেচারী বেচারাম!

বিজ্ঞানভিক্ষু

প্রসঙ্গ কথা

সোনার পাথরবাটি

মহামান্য গোখ্‌লে একদিন এই সোনার পাথরবাটির জয়গান করিয়াছিলেন, বেলে পাথরকেই সেদিন মনে হইয়াছিল পরশপাথর। হয়তো উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর সাধনাগুণে সামান্য প্রস্তর-খণ্ডও পরশমণির গুণ বর্ত্তিয়াছিল; বঙ্কিম-বিবেকানন্দের মন্ত্রবলে শতাব্দীশেষে অনেক লোহাই সোনা হইয়া উঠিয়াছিল। সাহিত্যে শিল্পে বিজ্ঞানে শিক্ষাবিস্তারে ব্যবসায়ে এবং স্বদেশপ্রেমে বাঙালী সেদিন সমস্ত ভারতবর্ষের সম্মুখে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, আজও পর্য্যন্ত তাহার তাহার যৎকিঞ্চিৎ মূলধন হইয়া আছে।

তারপর। কোথায় কি ঘটিয়া গেল, তৈরি বাঁশ—পাক ধরিবার পূর্ব্বেই কেমন করিয়া তাহাতে ঘুণ ধরিল, মাতৃমন্ত্রের সাধক শক্তিপূজারী বাঙালী কেমন করিয়া সাংস্কৃতিক, বিশ্বমুখী ও শক্তিহীন হইয়া কাঁদিল এবং চোখ রাঙাইয়া আপনার পূর্ব্বপ্রাধান্য বজায় রাখিতে চাহিল—এ ইতিহাসও আজ প্রকাশ করিয়া বলিবার বাধা আছে। বিংশ শতকে প্রায় মাঝামাঝি কালে হিসাব নিকাশ করিতে বসিয়া দেখা যাইতেছে—বাঙালী ঘরে বাইরে সর্ব্বত্র লাঞ্ছিত, হিন্দু-মুসলমান দুই বিবদমান সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং তাহার রাষ্ট্রীয় অধিকার পদে পদে ক্ষুণ্ণ।

আশ্চর্য্যের বিষয়, যে অনুপাতে তাহার সামাজিক, নৈতিক রাষ্ট্রিক পতন ঘটিয়াছে, ঠিক সেই অনুপাতেই ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি গৌরবে সভায় সভায় এবং সাময়িক-পত্রিকার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তাহার দম্ভ ও চীৎকার বাড়িয়া চলিয়াছে। এটাই দুর্লক্ষণ। পরশমণির যাদু অন্তর্হিত হইয়া নিরেট পাথর পায়ে পায়ে ধূলায় গড়াইতে গড়াইতে আর্ত্তনাদ করিতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কারণ বিশ্লেষণ করিবার বাধা আছে—ফলাফল আমরা চোখেই দেখিতেছি। বাংলা দেশে চিন্তার দৈন্য দেখা দিয়াছে। এই ভয়াবহ অবস্থায় জাতিকে সচেতন করিবার মত চিন্তাশীল মনীষী এখানে ওখানে আত্মগোপন করিয়া থাকিলেও সমাজে রাষ্ট্রে এবং সাহিত্যে চিন্তার অভাব এবং অরাজকতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে; মন্বন্তরের মুখে মহামারীর লক্ষণ দিকে দিকে সূচিত হইতেছে—মস্তক-বিরহিত কবন্ধদের তাণ্ডবনৃত্যে শ্মশানোৎসব জমিয়াছে ভালই। চিন্তালেশহীন তরুণ-তরুণীরা ইহাকেই সমৃদ্ধির উৎসব কল্পনা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে।

বাংলা দেশের পলিটিক্‌স ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করুন; দেশের ক্রমোন্নতির পক্ষে এগুলির সহায়তা মুখ্য এবং অনিবার্য্য; শিল্প ও সাহিত্য অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরের জিনিস। পলিটিক্সে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং দলগত প্রাধান্যের লড়াইয়ে সমস্ত দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎকে নির্ম্মমভাবে বলি দেওয়া হইতেছে। যাঁহারা সম্মানার্হ, যাঁহারা নেতা, তাঁহারা নিজেরাই কোনও না কোনও ক্ষুদ্র স্বার্থের বশীভূত হইয়া বৃহত্তর কল্যাণকে দূরে রাখিতেছেন—ফলে সর্ব্বত্র হাহাকার, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দৈহিক ও নৈতিক আত্মহত্যা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিপন্ন জাতিকে সৎপরামর্শ দিয়া সুপথ-চালিত করিবার দায়িত্ব কেহ লইতেছেন না।

এ যুগ দৈনিক সংবাদপত্রের যুগ। দৈনিকের পৃষ্ঠাতেই জাতির বর্ত্তমান ইতিহাস লিখিত হইতেছে,—পতন-অভ্যুত্থানের কাহিনীও এই দৈনিক পত্রগুলিতেই লিপিবদ্ধ থাকিয়া যাইতেছে। জাতির ভাগ্য-দেবতা জাতির সহিত পরিহাস করিতেছেন কি না, সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভেই তাহার নিদর্শন মিলিবে, সেখানে আমরা কি

দেখিতেছি?—অকরুণ দম্ভ এবং নিদারুণ চিন্তা-দৈন্য! ছলে বলে কৌশলে যে ব্যক্তি বা দল, অর্থ অথবা প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিতেছে তাহাদেরই জয়জয়কার! জাতির কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পথভ্রান্ত জনসাধারণকে সামান্য আলোর ইঙ্গিত দৈনিকগুলির কুত্রাপি নাই—একটা পলিসি পর্য্যন্ত কোনও পত্রিকায় স্থির নাই। আজ ইহার, কাল উহার তল্পি বহন করিয়া দৈনিকগুলি দিনগত পাপক্ষয় করিয়া চলিয়াছে। সংবাদগুলিই বর্ত্তমানে সংবাদপত্রের গৌণ বস্তু, মুখ্য বস্তু হইতেছে অমুক বস্ত্র অথবা অমুক সরকারের মহিমা কীর্ত্তন, অমুক লীগের অথবা অমুক মহাসভার ওকালতনামা লইয়া দর্শক-পাঠকদিগকে বিভ্রান্তকরণ। যাহারা এসব পছন্দ করে না, তাহাদের জন্য মজাদার সাড়ে বত্রিশ ভাজা প্রচুর পরিমাণেই পরিবেশিত হইতেছে—সিনেমা-তারকা অমুক বালার বাথরুমের খবর, খেলোয়াড় অমুক চাঁদের প্রেমের কাহিনী; ইহার উপর শিশুদের জন্য শিয়ালপণ্ডিত অথবা নিতাই মামা, মেয়েদের জন্য কুলো ধুচুনি এবং পুরুষদের জন্য বৈপ্লবিক রুশিয়া অথবা ইস্পাতের কাহিনী! লাচ্ছেদার গল্প, গদ্য-কবিতা ও বিলাতী হিউমার তো সর্ব্বসাধারণের জন্য আছেই। অতএব আর পরোয়া কি? ন্যায় ও নীতির মাথায় জুতা মারিলেও কাগজ চলিবে—রোটারির তালমাফিক গর্জ্জনগান বন্ধ হইবে না। চুলায় যাক জাতি, চুলায় যাক সমাজ!

* * *

একজন চিন্তাশীল বাঙালী কবি ও সাহিত্যিকের সহিত এ বিষয়ে কথা হইতেছিল। তিনি ঢাকার দাঙ্গার রিলিফের কথা তুলিলেন। বলিলেন, পত্রিকাগুলিতে বিভিন্ন দলের অর্থ সংগ্রহের জন্য আবেদন-নিবেদনের অন্ত নাই। আসল বিপদের ইহা প্রতিকারই নয়, অথচ একটি পত্রিকাতেও ইহা লইয়া আলোচনার চেষ্টা নাই। যাহারা

আক্রমণকারীদের ভয়ে ঘরবাড়ি, বিষয়সম্পত্তি, নারী ও শিশুদের ফেলিয়া খরগোশের মত গ্রামান্তরে পলায়ন করিয়াছে, গ্রামে কাহারও কাহারও বন্দুক থাকা সত্ত্বেও আক্রমণকারীদের বিন্দুমাত্র বাধা দিতে চেষ্টা করে নাই, রিলিফ দিয়া তাহাদিগকে ঘরে ফিরাইয়া আনিলে আবার তাহারা পলাইবে। আজ ঢাকায়, কাল খুলনায়, পরশু যশোহরে একই ব্যাপার ফিরিয়া ফিরিয়া ঘটিতে থাকিবে—ফলে রিলিফের নামে সমগ্র সমাজকে মোহন করিয়া দুষ্কৃতদেরই করা হইবে পরোক্ষ সহায়তা। এরূপ মারাত্মক অবস্থার প্রতিকার কি ইহাই? মার খাইতে খাইতে আত্মস্থ হইয়া নিজেদের উপর নির্ভর করাই যে একমাত্র প্রতিকার—জীবধর্ম্মের এই সামান্য গোড়ার কথাটাও তো কোনও সংবাদপত্র প্রচার করিল না! জাতিকে আত্মনির্ভরশীল এবং সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য যে নৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টির প্রয়োজন, এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষালয় দৈনিক সংবাদপত্রে তাহার বিন্দুমাত্র প্রয়াসও কি লক্ষিত হইতেছে?

* * *

আমরা বিপরীতটাই দেখিতেছি। কোন স্কুলের মাস্টার কোনও দুর্ব্বিনীত অশিষ্ট ছাত্রকে শাস্তি দিয়াছে—অমনই সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে ওজস্বী ভাষায় করা হইল সেই শিক্ষকের বিরুদ্ধে আন্দোলন; বলা হইল, এ যুগে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ চলিবে না। ছাত্রও মানুষ! আশ্চর্য্যের বিষয়, এখনও পিতা ও অভিভাবক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এই সকল স্বাধীনতা-ধুরন্ধরেরা লেখনী ধারণ করেন নাই! ছাত্রের দোষগুণের বিচার হইল না, শিক্ষকের অধিকারের কথা উঠিলই না, সংবাদপত্রের সমবেত চীৎকারে কর্ত্তৃপক্ষ তটস্থ হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন! স্কুল-কলেজে অকারণ ধর্ম্মঘটকারীদের স্বপক্ষে পত্রিকাগুলিতে কি ভাবের লেখনীকণ্ডূয়ন চলিয়া থাকে এবং ইহাদের

সমবেত চেষ্টায় স্কুল-কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ কিভাবে প্রত্যহ আপনাদের অধিকার—ন্যায়ের অধিকার সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন, ইহা আমরা প্রত্যহই দেখিতেছি।

* * *

সেকেণ্ডারি এডুকেশন বিল লইয়া বাংলাদেশব্যাপী ঘোরতর আন্দোলনের কথা উঠিলে তিনি বলিলেন, আমরা নিজেদেরই অনাচারের দ্বারা যে এই বিলকে ডাকিয়া আনিয়াছি, এই সত্য কথাটা তো কোনও পত্রিকাতেই উল্লিখিত হইতে দেখিলাম না! দেশের ভবিষ্যৎ শিশু ও বালকবালিকাদের শিক্ষার নামে আমরা এতদিন যে ছিনিমিনি খেলিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথাভারী জমিদারী রক্ষার জন্য শিক্ষাসংস্রবহীন পরীক্ষা ও হাজার-করা পাসের যে বিসদৃশ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচনে ছাত্রছাত্রীদের আসল শিক্ষার দিকে না তাকাইয়া যে ব্যক্তিগত স্বার্থের খেলা হইয়াছে, এবং অর্ব্বাচীন পরীক্ষার্থীদের পাসের জন্য যে মারাত্মক কল বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া বসিয়াছেন, তাহার ফলে এ যুগের ছেলেমেয়েদের, সুতরাং দেশের ও জাতির যে সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে, সেকেণ্ডারি এডুকেশন বিল কার্য্যকরী হইলে তাহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতি কি হইবে! এই ব্যাপারে দৈনিক পত্রিকাগুলিই কি কম ক্ষতি করিয়াছে? পরীক্ষা-খাল পার হইবার সমস্ত সুবন্দোবস্তের কথা জানা সত্ত্বেও প্রশ্নপত্রের কাঠিন্য লইয়া যে লজ্জাকর আন্দোলন ইঁহারা করিয়া থাকেন, ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক অপমৃত্যুর তাহা কি কম সহায়ক? কিন্তু এসকল কথা চিন্তা করিতেছে কে!

* * *

আর শিল্প ও সাহিত্যের কথা না তোলাই ভাল! ভাষা ও সংস্কৃতিতে আমরা ভারতবর্ষে শীর্ষস্থানীয়—এই ঘৃণ্য এবং আত্মঘাতী প্রচারে সহায়তা করিতেছে কে? আমরা যখন ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া আত্মমহিমার স্বপ্ন দেখিয়াছি, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ তখন প্রাণপণ প্রয়াসে আমাদিগকে ছাড়াইয়া যে চলিয়া গিয়াছে, একথা শোনাইবার মত সহৃদয় ব্যক্তি কি একজনও নাই! শিল্প ও সাহিত্যের অনাচার প্রতিদিন প্রশ্রয় পাইতেছে এই সকল দৈনিক পত্রিকারই পৃষ্ঠায়; দলীয় আকর্ষণে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিরা আত্মপ্রচারের অপূর্ব্ব সুযোগ লাভ করিতেছে, এবং অপ্রচারের দ্বারা বিস্মৃত হইবার ভয়ে প্রধানেরাও যে এই 'মান্নার জাতে' পরস্পরের পশ্চাদ্দেশে ঠেকা দিয়া চলিতেছেন—এ সত্যও কি চোখে আঙুল দিয়া কেহ দেখাইবে না!

—

'সভ্যতার সংকট'

গত ১লা বৈশাখ তারিখে আশি বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে জন্মোৎসবে রবীন্দ্রনাথ যে অভিভাষণ দিয়াছেন, নিবিবার পূর্ব্বে প্রদীপের শেষ উজ্জ্বলতায় তাহা প্রদীপ্ত; এতখানি ক্ষুরধার শাণিত ভাষণ তাঁহার বয়সে আশা করা যায় না। তবে এই ক্ষুরধারও সমগ্র মানব-জাতির কল্যাণের শান্তসমাহিত ব্যথিত চিন্তায় শোণিতরাঙা হইয়া উঠিয়াছে; বিষাদটাই আমাদের বুকে বাজিতেছে—বিদ্বেষ নয়। সমাপ্তিতে আশার কথা আছে, ধূল্যবলুণ্ঠিত মহিমার মধ্যে ইংরেজের সহিত ভারতবর্ষের সত্যকার মিলনের ইঙ্গিত আছে, পূর্ব্বদিগন্তে মহামানবের আবির্ভাবের কথা আছে।

ভারতবর্ষকে পূর্ব্বদিগন্ত কল্পনা করিয়া আমরা যেন উল্লাস না করি।

পাশ্চাত্য সভ্যতার যে সঙ্কটই আসিয়া থাকুক, বর্ত্তমান পৃথিবীতে আমাদের অবস্থা যে হীনতম, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কবি বলিতেছেন—

সভ্যশাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়, সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্ম-বিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাইনি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্বশাসন-চালিত দেশে।

এ কথা আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই ভয়াবহ দুর্গতি হইতে মুক্তির উপায় আমাদের সামাজিক মুক্তির মধ্যেই নাই; ভারতবর্ষীয় মুসলমান সমাজকেও ক্রমশ ভারতমুখী করিয়া তুলিবার দায়িত্ব আমাদেরই। ইহা যদি আমরা করিতে সক্ষম হই, তবেই ভারতবর্ষের সঙ্কট দূর হইবে। সমস্ত পৃথিবীতে যে সভ্যতার সঙ্কট, সভ্যতার মারণাস্ত্রের দ্বারাই একদিন তাহা দূর হইবার আশা আছে, কিন্তু আমাদের দেশে তথাকথিত ধর্ম্মের সঙ্কট অনেক বেশি মারাত্মক, অজ্ঞানতার অন্ধকারে তাহার মূল বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত। সমস্ত দুর্গতির মধ্যে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তাই আমাদিগকে অহরহ মনে মনে জপ করিতে হইবে—

পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা ক'রে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই।...মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষে করব। আশা করব, মহা প্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।

"অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।"

সংবাদ-সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের অশীতিবর্ষ পূর্ত্তি এই বৎসর-প্রারম্ভের একটি ঘটনা, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া জাতীয় উৎসব চলিতে পারে, চলিতেছেও। কবি-সম্রাটের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের নানা দিক বিশ্লেষণ করিয়া নানা জনে প্রবন্ধ লিখিতেছেন ও বক্তৃতা দিতেছেন। সমগ্র জাতি ঐকান্তিকভাবে তাঁহার শতায়ু কামনা করিতেছে।

* * *

এই সকল প্রবন্ধ ও বক্তৃতার মধ্যে কবি ও মানুষ রবীন্দ্রনাথের যতটুকু ব্যক্তিগত পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই আমরা পরম লাভ বলিয়া গণ্য করিতেছি। অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার সর্ব্বপ্রথমশ্রুত রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ও প্রমথ চৌধুরী যুবক রবীন্দ্রনাথের দেহ-সৌন্দর্য্যের যে বর্ণনা দিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রনাথের যে হাস্য-রসিক মূর্ত্তিটি দেখাইয়াছেন, বহু মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষ-মহিমান্বিত প্রবন্ধের চাইতে সেগুলি আমরা বেশি উপভোগ করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সৃষ্ট বিপুল শিল্প-সাহিত্য-সম্ভার অস্তাচলে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবেন না; আমাদের মত মর্ত্ত্য-মানবের দ্বারা পূজিত, বিশ্লেষিত ও লাঞ্ছিত হইবার জন্য সেগুলি যাবচ্চন্দ্রদিবাকর বর্ত্তমান থাকিবে, কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথ থাকিবেন না। সময় থাকিতে থাকিতে তাঁহার যেটুকু পরিচয় পাই, সেইটুকুই আমাদের লাভ। এই সকল উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার স্বরূপ ক্রমশ উদ্ঘাটিত হইতেছে বলিয়াই এগুলির সার্থকতা।

* * *

জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথের নিতান্ত ব্যক্তিগত দুইটি পরিচয় প্রকট হইয়াছে দেখিলাম। জয়ন্তী-ব্যপদেশে একদল বক্তা ও প্রবন্ধ-লেখক বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ আজও ছাত্র, শিখিবার বিষয় এবং সুযোগ পাইলে তিনি তাহা অবহেলা করেন না; বৃদ্ধবয়সে মোটা মোটা বায়োলজির বইও তাঁহাকে পড়িতে দেখা যায়। এ কথা যে সত্য, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'র ২০১ পৃষ্ঠায় "সাহিত্যের মূল্য" প্রবন্ধে। যৌবনের লেখা রবীন্দ্রনাথের "ফেল" গল্প পড়িয়াছি;

"টেবিলে"র মত "পাস ফেল"ও বাংলা হইয়া গিয়াছে, ইহাই আমরা জানিতাম। কিন্তু একাশি বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ যখন লিখিলেন,

এই জন্য রসের ব্যবসা সর্বদা **ফেইল** হবার মুখেই থেকে যায়।

তখন বুঝিলাম পূর্ব্ববঙ্গীয় ট্রান্স্‌লিটারেশন-স্কুল হইতে নূতন উচ্চারণভঙ্গি লেখায় প্রকাশ করিবার শিক্ষা তিনি আয়ত্ত করিয়াছেন। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম মুদ্রাকরপ্রমাদ, কিন্তু পত্রান্তরে ঐ একই প্রবন্ধ একই কালে "ফেইল"-মার্কা হইয়া প্রকাশিত হইতে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের চিরসচল মনের পরিচয় পাইয়া বিস্ময়বোধ করিলাম। ভাবিতেছি, রেইল যোগে অর্থাৎ ট্রেইনে চাপিয়া "শূন্য চেইয়ারে"র পাশে শয়ান রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানাইয়া আসিব।

* * *

বাল্যকালে বৃদ্ধদের মুখে শুনিতাম, রবীন্দ্রনাথ প্রেমের ব্যাপারে অত্যন্ত চঞ্চল, সব-কিছুকে পিছনে ফেলিয়া দ্রুত আগাইয়া যাইতে জানেন। তখন রাগ করিতাম, কিন্তু জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথ বমাল ধরা পড়িয়া গিয়াছেন। ২২৯-২৩২ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত তাঁহার তিনটি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমটি লেখা গত চৈত্র মাসের ১৫ই (২৯।৩।৪১) ; দ্বিতীয়টি ঐ মাসের ২৩এ এবং তৃতীয়টি ঐ মাসের ২৭এ তারিখে (১০ এপ্রিল, ১৯৪১)। অর্থাৎ তিনখানি পত্র তেরো দিনের মধ্যে লিখিত। প্রথমটির পাঠ "শ্রদ্ধাস্পদেষু", দ্বিতীয়টির "প্রিয়বরেষু" এবং তৃতীয়টির "প্রীতি-ভাজনেষু" ; বুড়া বয়সে এই তেরো দিনেই শ্রদ্ধা যদি অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া প্রীতিতে পর্য্যবসিত হইতে পারে, যৌবনে কি ঘটিয়াছে সহজেই অনুমেয়। এই সকল ব্যক্তিগত পরিচয়ের চিহ্ন যে কলম্‌চিরা বুদ্ধি করিয়া নষ্ট করিয়া বসেন নাই, এজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ।

—

জ্যৈষ্ঠের 'ভারতবর্ষে'র একটি সুলিখিত গল্পের কয়েকটি পংক্তি এইরূপ :—

ফার্পোর সামনে শ্রেণীবদ্ধ ট্যাক্সির ভিড়—পন্টিয়াক হইতে মার্মেডিজ বেএজ পর্য্যন্ত। নিয়নসাইনের সরু সরু রেখাগুলিকে তাহার প্যারিসবাসিনী তরুণীদের পেন্সিলে আঁকা

ভুরু বলিয়া ভুল হয়। কার্জন পার্কটা যেন ট্রাফালগার স্কোয়ার, কিম্বা প্যালে দ্য কনকর্ড। অশোক মনে মনে হাওড়া ষ্টেশনের নাম দিয়াছে—গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল টার্মিনাস।

লেখকের না থাক, 'ভারতবর্ষে'র কর্ত্তাদের তো গাড়ির কারবার আছে—"মার্মেডিজ বেএজ"-এর বেইজ্জতিটা তো তাঁহারা রোধ করিতে পারিতেন! আর অশোক এতই যখন দেখিল, তখন কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীটকে ফ্লীট ষ্ট্রীট ও মৌলভী ফজলুল হককে উইন্‌স্টন চার্চ্চিল রূপে দেখিলেই তো "পিক্‌চার কম্‌প্লিট" হইত!

—

অমিয় চক্রবর্ত্তীকে চেনেন? রবীন্দ্রনাথের পরেই যিনি নেক্‌স্ট্ বেস্ট্ বিশ্বমানব, হিট্‌লারের পরেই যথা গ্যোয়েরিং! এই অপার্থিব জীবটি একটি "পার্থিব" কবিতা লিখিয়াছেন ১৩৪৮ সনের বার্ষিক 'বৈশাখী'তে। বারো লাইন কবিতার মধ্যে বিশ্ব তালগোল পাকাইয়া ছাতু-সানা হইয়া গিয়াছে—ভারতীর আর্ত্তনাদ লণ্ডনের উপরে শুনা যাইতেছে—সম্মিলিত বোমারু বিমান-বাহিনীর আওয়াজ যেন! শুনুন অখণ্ড কবিতা একটি—

বিশুষ্ক একখানি নলিনীচন্দ্র পাকড়াশি
মাছ বা ল্যাংড়া আম
আধুনিক কৃষ্ণ বাজায় ফুটের বাঁশি
এই সব বাস্তব সত্যের পরিণাম।
জাপানী খদর, স্বদেশী বোমারুর উদয়,
আবার স্বাধীন মেয়ে, ধর্ম্মঘট,
চাপা-পড়া কুলিকে গুলি, সুনিশ্চয়
নিয়ন্ত দেশে ভালো সঙ্কট।
অপার্থিব কী তা কেউ জানে না
ক্ষতি নেই : বাহিরে সুন্দর রোদ্দুর,
মন্দিরের মধ্যে বাদুড়, পাণ্ডা,—বাঁচা যদ্দুর
দোকানের দাওয়ায় ব'সে দেখে নে না।

যে হতভাগ্য পণ্ডিতেরা এরূপ অপার্থিব কবিতা বিশেষ কারণে ছাপিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহারাও যে এটির মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে পারে নাই, তাহার প্রমাণ শিরোনামায় আছে। তাঁহারা শিরোনামা

ছাপিয়াছিলেন "পাথিক"—ভাবিয়াছিলেন "পাথিক্" কোনও গুপ্ত বিশ্বব্যাপার! "পার্থিব"-চিপি পরে আঁটা হইয়াছে।

—

এবারে প্রবীণ সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও নবীন অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসু স্ব স্ব পত্রিকায় আত্মমহিমা প্রচারে পরস্পর পাল্লা দিয়াছেন; ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের এইটিই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী' এবং 'বৈশাখী' ও রবীন্দ্র-সংখ্যা 'কবিতা' দ্রষ্টব্য। চারণ (চারণই বটে!) বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে "নববর্ষের প্রণাম" জানাইয়াছেন—

সত্য আর স্বাধীনতা এই দুটি আদর্শের লাগি।
জাতির শিয়রে তব নিদ্রাহীন চিত্ত আছে জাগি
মহান্ প্রহরীসম।...
ইস্পাত-কঠিন তব সংকল্পের দুর্জ্জয় শক্তিরে
ঈর্ষা করি।...

আমরাও করিতাম, কিন্তু ইস্পাত-কঠিন যে সীসা-নরম হইয়া আসিয়াছে, সেই কারণেই আমাদের দুঃখ। দুর্জ্জয় সাহসী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই প্রণামকেও সদরে সোজাসুজি লইতে পারেন নাই। ২৩৪-৩৫ পৃষ্ঠার "আলোচনা" ও ২৬২-৬৩ পৃষ্ঠার "বিবিধ প্রসঙ্গ"ও দ্রষ্টব্য।

*

ও দিকে বুদ্ধদেব বলিতেছেন, আমাকে দেখ—আমিই কম কিসে! বৈশাখীর "আলোচনা" আত্মমহিমায় জবজব। প্রচার-সচিবের অভাব উভয়ের কাহারও হয় নাই। বর্ত্তমান যুগে প্রবীণ নবীন উভয় সম্পাদক মিলিয়া পত্রিকা-সম্পাদনার যে আদর্শ খাড়া করিতেছেন, তাহা অনুকরণীয় বটে!

*

প্রসঙ্গত একটা কথা বলিতে ইচ্ছা হয়। 'প্রবাসী'র সহকারী সম্পাদকমণ্ডলী কি সকলেই ঠুঁটো? লেখক-সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহাদের একজনেরও নাম নাই কেন? অথবা পুত্রকন্যাজামাতা অপেক্ষা তাঁহারা কি বেশি আপন?

—

বালিগঞ্জ হইতে প্রকাশিত একটি আধুনিক মাসিক-পত্রে যেনা

ঘোষ নামীয় একজন ভদ্রমহিলা এযুগে আমাদের মেয়েরা কি ভাবে জল্পনা কল্পনা করিয়া থাকেন, নিজের রচনার সাহায্যে তাহার কিছু নমুনা প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহার উল্টাপিঠেই ডক্টর কালিদাস নাগ আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং এই শ্রীমতী যেনা ঘোষকে হেলাফেলা করিতে পারি না। তাঁহার বক্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি:

দেহের ও মনেরও একটা খোরাক আছে—তাকে বুভুক্ষু রাখলে সে শুকিয়ে মরবে। সমাজের গণ্ডী ছেড়ে উন্মুক্ত সমাজেই যখন এসেছি, তখন আবার কেন যাব অন্য একটা গণ্ডীতে? বিয়ে যখন করিনি, বেশ করেছি—হয়ত সুবিধামত হয় নি'। মর'ব কেন, বাঁচব আরও ভালভাবে। হাস্‌ব, খেল্‌ব, নাচব, পড়ব—; যদি অন্য কোনও বিশেষ কাজে ব্যস্ত না থাকি।...বয়সের সাথে বয়োবৃদ্ধির ছাপকে ঢেকে রাখতে পারে বুদ্ধির ছাপ। রূপের রং বদলে দিলে চল্লিশ বছরেও জৌলুস্ থাকবে।—সংস্কারকে ভাংতে না পারলে আমরা কোনও দিক্ দিয়েই এগিয়ে চলতে পারব না।...মেয়েদেরও সময় সময় পুরুষের মত এক একটা মুড্ আসে। অবস্থার তারতম্যে হয় অবনমিত মেজাজ কিংবা ভাবকে মূর্তি দিতে উৎসুক মন—তখনই একটা কিছু প্রয়োজন, যেমন চা, পান, সিগ্রেট, ড্রিঙ্ক্স্। বহু পুরাকালে মেয়েরা সোমরস এবং তামাকু সেবন কর্তেন;...আধুনিক প্রগতি-পথের মেয়েরা সে সব ছেড়ে শুধু চা, লিমনেড, সোডা, কিংবা ঘোলের সর্বতেই তুষ্ট।...প্রসূতিরা দামী পোর্ট খাবে, আপত্তি নেই, শক্তি পাবে ফিরে। ভার-মুখ কিংবা হইস্‌কির নামেই আমরা দেই নাক সিট্‌কানি—অবনমিত মনকে যদি খোস্ মেজাজেও ফিরিয়ে আনে তবুও ঘোরতর আপত্তি মেয়েদের বেলায়। কারণ, প্রগল্‌ভতার বলে একটা সীমা আছে।...মননশীলা মেয়েদের যদি সিগ্রেট কিংবা ভারমুখ পানে মনন-শক্তির উদ্দীপনা দেয়, সে ক্ষেত্রে প্রগল্‌ভা হওয়াই উচিত।

আমাদের ইহাতে নৈতিক অথবা সামাজিক আপত্তি নাও থাকিতে পারে; চিরতরুণ দেবীদাসের আইডিয়ালই ছিল—হুইস্কি খায়, আই.এ. পাস; কিন্তু আর্থিক সঙ্কটের ভয়ে ইহার সমর্থন করিতে পারি না। রোজগার তো সেই আমাদিগকেই করিতে হইবে!

রসিকতা যাক, "প্রসঙ্গ কথায়" বলিয়াছি, এই সকল সমস্যার কথা আমাদের চিন্তাশীল নেতারা এড়াইয়া চলিতেছেন। সোজাসুজি এ-গুলির সম্মুখীন হইয়া উপায় চিন্তা করিতে হইবে; ইহা ছাড়া অন্য পথ নাই।

—

গল্প শুনি, নৈষধ-কাব্যের কবি কাব্যটির রচনা শেষ করিয়া সে যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক তাঁহার মাতুলের নিকট হাজির করিয়াছিলেন,

নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া তাঁহার মাতুল বলিয়াছিলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে উক্ত কাব্য হাতে পড়িলে তাঁহাকে অনর্থক অলঙ্কার-দোষের নমুনা খুঁজিবার জন্য কাব্য-সমুদ্র হাতড়াইতে হইত না ; এক নৈষধেই তাঁহার কাজ হইত। জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে নৈষধ-জাতীয় একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীভ্রমর ঘোষ, এম. এ. লিখিত—নাম "অসময়"। ছাপা যখন হইয়াছে, তখন সুসময়ই বলিতে হইবে। 'প্রবাসী'র কান যে কীদৃশ দীর্ঘ, ইহাতে তাহার প্রমাণ মিলিবে। "হ'লো পদ"-এর সঙ্গে "নির্ব্বাপিত"-এর মিল দিবার ভয়েই সম্ভবত "কবিতা"-সম্প্রদায় গদ্য-কবিতার চর্চ্চা করেন। ভালই করেন। আগমিল, জিগাসিল, উত্তল ইত্যাদি পদে স্বর্গলোকে মধুসূদন উল্লসিত হইবেন। ছন্দের কথা বাহুল্য। ইহার পরেরই প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের প্রশ্ন "মানুষ কি অতঃপর ঘাস খাইবে ?" পাঠকেরা মানুষ নিশ্চয়ই।

—

আধুনিক কবিদের সঙ্গে যে 'প্রবাসী'র বিরোধ, বৈশাখ সংখ্যাতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং কবিতার অন্যতম পাণ্ডা কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ঠাকুরদাদার আশ্রয় হইলেও যে 'প্রবাসী'তে বঞ্চিত হইবেন, জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে তাঁহার "বঞ্চনা" কবিতাই তাহার প্রমাণ। ঠাকুরদাদা ইচ্ছা করিয়াই নাতির ছন্দের ঠ্যাং ভাঙিয়া দিয়াছেন। যথা—

> ঘন বনে শুধু ঝিল্লীর ঝঙ্কারে
> মর্ম্মর শুকনো পাতার ভীড় ;
> তব চরণের চুম্বনঘন ক্ষণে
> বাজায়ো না আর কঙ্কণ অস্থির।

'মর্ম্মর'কে সঙ্গীহীন করাতে মর্ম্মান্তিক "পরিস্থিতি"র উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু নাতিও কম নন ; শেষ স্ট্যাঞ্জায় 'প্রবাসী'র চল্লিশ বৎসরের বনেদী প্রতিষ্ঠা রাম-লেঙ্গি মারিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। যথা—

> আত্মার কারো পাকধরা দাগ লাগা
> ভার বয়ে বয়ে কারো পিঠ গেছে বেঁকে,—
> এই পৃথিবীর নিদারুণ বঞ্চনা
> নিষ্ঠুর হাতে নিজেকে দিয়েছে এঁকে।

—

'প্রবাসী' যে জাতির নৈতিক চরিত্ররক্ষায় কতখানি উদ্যোগী, এই মাসের 'প্রবাসী'র শেষ পৃষ্ঠার সম্মুখের বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠাতেই তাহার পরিচয় আছে। কাশ্মীরী বটী, মালিশের তেল, সিওর-সন এবং আর্ট ফটো ! শুধু কলপের বিজ্ঞাপন নাই !

*

এই সংখ্যার 'প্রবাসী'তে বাঁকড়া সমালোচনার যে অপূর্ব্ব নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিবার জন্যই রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবী হওয়া প্রয়োজন ছিল। তাঁহার একাশিতম জন্মদিন সার্থক হইয়াছে। শ্রীযুগলকিশোর সরকারের "সবলা" (পৃ. ২৬৬-৬৮) এক ঘুষিতে বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমর ও মহাভারতের দ্রৌপদীকে কাত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সবল থাকিলে খুশি হইতেন !

তারপর 'পুস্তক-পরিচয়ে' (পৃ. ২৪২) "ড." রা না কাড়িলেও চমৎকার আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা এতদিনে সার্থক হইল। 'জন্মদিনে' পড়িয়া "ড." লিখিতেছেন—

> রবীন্দ্রনাথের এই নূতনতম কবিতার পুস্তকটিতে ২৯টি কবিতা আছে। সবগুলি পড়িয়া তাহাদের অন্তর্নিহিত রস ও অনুপ্রাণনা হইতে অন্তরে কিছু আনন্দ ও শক্তি সঞ্চয় করিতে এই লেখকের অধিক সময় লাগে নাই।...যোগ্যতর ব্যক্তির দ্বারা ২৯টি কবিতার উপর ২৯টি ছোট বড় প্রবন্ধ লিখিত হওয়া আবশ্যক।

হায়, পুরাতন রবীন্দ্রনাথ ! তোমার 'চিত্রা,' 'কল্পনা,' 'ক্ষণিকা'র উপরেও ২৯টি প্রবন্ধ আজতক লিখিত হয় নাই !

'গল্পসল্প' পড়িয়া 'ড.' লিখিতেছেন—

> এই নূতনতম গল্পের বহিটিতে বত্রিশটি ছোট গল্প আছে। গোড়ায় দুটি কবিতা আছে। মধ্যাহ্নবিশ্রামের ব্যাঘাত করিয়া আগাগোড়া পড়িয়া ফেলিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের ভাগ্য বলিতে হইবে !

—

হের হেসের স্কট্‌ল্যাণ্ডে অবতরণ-সংবাদ পৃথিবীব্যাপী চাঞ্চল্য আনিয়াছে। হিট্‌লার প্রচার করিতেছেন, তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে। আপনার জনকে লইয়া এরূপ বিবৃতি দেওয়ার ট্র্যাজেডি বাংলা দেশের একজন মহাপুরুষকেও অত্যন্ত দুঃখের সহিত বহন করিতে হইয়াছে। তিনি 'প্রবাসী'-সম্পাদক মহাশয়। সহ-সম্পাদকীয় মুদ্রণ-

ভ্রান্তির জন্য তাঁহাকেও 'বিবিধ প্রসঙ্গে' (পৃ. ২৬১) বিবৃতি দিতে হইয়াছে। আমরা সমবেদনা জানাইতেছি।

—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক 'মধুসূদন-গ্রন্থাবলী' প্রচার এই বৎসরে বাংলা সাহিত্য-জগতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড (কাব্য) প্রকাশিত হইয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ড (নাটক ও বিবিধ) শীঘ্রই বাহির হইবে। দুই খণ্ডের মূল্য রাজসংস্করণ ১৫৲ ও সাধারণ সংস্করণ ১০৲। প্রত্যেকটি কাব্য নাটক স্বতন্ত্র পুস্তকাকারেও পাওয়া যায়। এমন নির্ভুলপাঠসম্পন্ন সুদৃশ্য কাগজে বড় অক্ষরে টীকা ও ভূমিকা সম্বলিত সংস্করণ ইতিপূর্ব্বে আর বাহির হয় নাই। প্রত্যেক বইয়ের পাঠভেদ এবং 'তিলোত্তমা কাব্যে'র সম্পূর্ণ প্রথম সংস্করণও এই গ্রন্থাবলীতে দেওয়া হইয়াছে। মধুসূদনের একটি সদ্য-আবিষ্কৃত তৈলচিত্র হইতে তাঁহার সম্পূর্ণ নূতন একটি চিত্র প্রথম খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

—

বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাসাগর কলেজের সর্ব্বাধ্যক্ষ (প্রিন্সিপাল) নির্ব্বাচন লইয়া নানা অভিযোগ আমাদের কানে আসিতেছে। আমরা কিছু কিছু গুহ্য কাগজপত্র দেখিয়া এই ব্যাপারের মূলে একটা চক্রান্তের আভাস পাইতেছি। প্রয়োজন হইলে এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখিব। আপাতত এই প্রশ্নই সকল বাঙালীর মনে জাগা স্বাভাবিক যে, তিনজন সিনিয়র প্রার্থীর দাবি নাকচ করিয়া নির্ব্বাচন-সমিতি অপেক্ষাকৃত অনুপযুক্ত পাত্রকেই নির্ব্বাচন করিলেন কেন? যদি এখনও পুনর্ব্বিবেচনার সময় থাকে, কর্ত্তৃপক্ষকে তাহাই করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। ইহা শুধু আমাদের অনুরোধ নয়, সমগ্র বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনুরোধ।

—

আমাদের শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক বন্ধু সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আজ (১ জ্যৈষ্ঠ) বেলা বারোটার সময় পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বশেষ রচনা একটি গল্প আমাদের হাতে মজুত আছে, আগামী সংখ্যায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ সেটি প্রকাশিত হইবে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত